খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিষয়ক ১০১টি প্রশ্নোত্তর

খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার

সহজপাঠ

VOTE
VOTE

খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার

সংক্ষেপিত

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক - খানি

খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার সহজপাঠ

প্রকাশ
জুলাই ২০২৬

প্রকাশক
বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক- খানি
www.khanibangladesh.net

রচনা
নুরুল আলম মাসুদ
উম্মে সালমা

সম্পাদনা
বরকত উল্লাহ মারুফ

প্রকাশনা সহযোগী
ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড

স্বত্ব, ব্যবহার ও পুনঃপ্রকাশ
© **২০২৬** পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

এই প্রকাশনাটি Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) লাইসেন্সের আওতায় প্রকাশিত। মূল উৎস যথাযথভাবে উল্লেখ করে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বইটির সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ অনুলিপি, পুনর্মুদ্রণ, অনুবাদ, উদ্ধৃতি, বিতরণ, অভিযোজন এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। বইটির কোনো অংশ পরিবর্তন, সংযোজন বা সম্পাদনা করে পুনঃপ্রকাশ করা হলে তা যেন মূল প্রকাশনার অনুমোদিত বা আনুষ্ঠানিক সংস্করণ হিসেবে উপস্থাপন না করা হয়।

এই প্রচারিাভযানের বিষয়ে যে কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন-
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান
বিশ্বাস কুঞ্জছায়া, বাড়ি ২২/২ (২য় তলা), খিলজি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ইমেইল : contact@praan.org.bd
ওয়েবসাইট : www.praan.org.bd

মুখবন্ধ

খাদ্য কোনো দয়া, অনুগ্রহ বা সাময়িক সহায়তা নয়। পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

খাদ্যকে কেবল উৎপাদন বা সরবরাহের বিষয় হিসেবে দেখলে চলবে না। খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট আইন, দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, পর্যাপ্ত বাজেট, নির্ভরযোগ্য তথ্য, মানুষের অংশগ্রহণ এবং কার্যকর অভিযোগ ও প্রতিকারব্যবস্থা। মানুষকে সুবিধাভোগী নয়, অধিকারধারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ববাহক হিসেবে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

খানি বাংলাদেশের প্রকাশিত এই প্রাথমিক পাঠে ১০১টি প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টির মৌলিক ধারণা, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, আইন ও নীতি, কৃষি, বাজার, সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহির বিষয়গুলো সহজ ও ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি কেবল একটি তথ্যপুস্তিকা নয়। এটি অধিকার বোঝা, দাবি তোলা এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সহায়ক উপকরণ।

আমরা আশা করি, বইটি নাগরিক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সাংবাদিক, গবেষক, উন্নয়নকর্মী, জনপ্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা সৃষ্টি করবে। একই সঙ্গে একটি সমন্বিত খাদ্য অধিকার আইন ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার দাবিকে আরও শক্তিশালী করবে।

খাদ্যের অধিকার কাগজে স্বীকৃত থাকলেই যথেষ্ট নয়। এই অধিকার মানুষের জীবনে দৃশ্যমান হতে হবে। কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না, কেউ বৈষম্যের কারণে বাদ পড়বে না এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে প্রত্যেকে প্রতিকার চাইতে পারবে। এই প্রত্যয় থেকেই বইটির প্রকাশ।

নুরুল আলম মাসুদ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক- খানি

সূচিপত্র

অধ্যায় ১. খাদ্যের অধিকার কী?

খাদ্যের অধিকারের প্রধান দিকসমূহ	০১
খাদ্যের অধিকার নিয়ে সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা	০৮
খাদ্যের অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকারের মধ্যে সম্পর্ক	১২
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে খাদ্যের অধিকার	১৭

অধ্যায় ২. কীভাবে খাদ্যের অধিকার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়?	২৯
অধ্যায় ৩. রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য পক্ষের দায়িত্ব	৩৭

অধ্যায় ৪. কীভাবে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন করা যায়?

আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৪৫
কৃষি, ভূমি, পানি, বাজার ও সামাজিক সুরক্ষা	৫১
পুষ্টি, খাদ্যমান ও জনস্বাস্থ্য	৫৯
জলবায়ু, দুর্যোগ ও মানবিক সংকট	৬১
তথ্য, প্রযুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও সক্ষমতা	৬৬
অর্থায়ন, অংশীদারত্ব ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা	৬৯
ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার ও মূল্যায়ন	৭৯

অধ্যায়- ১

খাদ্যের অধিকার কী?

খাদ্যের অধিকারের প্রধান দিকসমূহ

১.খাদ্য কী?

খাদ্য বলতে সেইসব পুষ্টিকর আহার্যকে বোঝানো হয় যা কোনো প্রাণী তার জীবনধারণ, শক্তি উৎপাদন, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য গ্রহণ করে। খাদ্য হলো এমন নিরাপদ ও ভোজ্য পদার্থ, যা মানুষের জীবনধারণ, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি সরবরাহ করে।

২. পর্যাপ্ত খাদ্য কী?

পর্যাপ্ত খাদ্য বলতে এমন খাদ্যকে বোঝায়, যা শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণে যথেষ্ট এবং গুণগতভাবেও পুষ্টিমান সম্পন্ন। পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি মানে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে যা ক্ষুধা নিবারণের পাশাপাশি বয়স, শরীরের গঠন এবং চাহিদা অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করবে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ভিটামিন ও খনিজ: যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আমিষ: মাছ ও মাংস, যা শরীরের বৃদ্ধি ও কোষ গঠনে অপরিহার্য।

শর্করা: ভাত ও রুটি, যা শরীরে শক্তি সরবরাহ করে।

চর্বি: পনির ও তেল, যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি জোগায়।

পানি: যা শরীরের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করে

এসব পুষ্টিকর উপাদান যদি দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় নিশ্চিত করা যায়, তবেই তাকে পর্যাপ্ত খাদ্য বলা যেতে পারে।

৩. অধিকার কী?

অধিকার হলো একটি নৈতিক, ন্যায্য এবং সম্মানজনক ধারণা, যা কোনো কিছুর ওপর কারো দাবি বা স্বত্বকে বোঝায়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত ও সবার জন্য সংরক্ষিত সুযোগ বা সুবিধার সমষ্টিকে অধিকার বলা যায়। প্রকৃতি অনুসারে

অধিকার প্রধানত দুই ধরনের- নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার। নাগরিকের সামাজিক, পারবারিক ও ধর্মীয় ন্যায়বোধ ও বিবেকবোধ থেকে উদ্ভূত অধিকার হলো নৈতিক অধিকার, যা সামাজিক ন্যায়বোধের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট, আইন দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা বা দাবিকে আইনগত অধিকার বলা হয়, জনগণের জন্য যা নিশ্চিত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা থাকে; নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আইন অনুযায়ী তার প্রতিকার পাওয়ার বিধান থাকে। ব্যক্তির বিকাশ, স্বাধীনতা ভোগ এবং নিরাপদ জীবনের জন্য অধিকার সুরক্ষা অপরিহার্য এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

৪. খাদ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায় এবং কেন এটি মর্যাদাভিত্তিক অধিকার?

খাদ্যের অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের জন্য বা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্য মর্যাদার সঙ্গে সংগ্রহ ও ভোগ করতে পারে। এটি শুধু ক্ষুধা নিবারণ বা খাবার পাওয়ার বিষয় নয়— খাদ্য উৎপাদন, ক্রয় বা সংগ্রহের সুযোগও এই অধিকারের অংশ। একই সাথে, নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ, সুষম ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তাও খাদ্য অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খাদ্য মানুষের জীবন-স্বাস্থ্য-স্বাধীনতা ও মর্যাদার ভিত্তি। ক্ষুধার কারণে মানুষ উপার্জন, কাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ হারালে তার অন্য অধিকারগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই খাদ্যকে কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা পণ্য হিসেবে দেখা যায় না।

রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সকল মানুষের খাদ্য অর্জনের বিদ্যমান মাধ্যমগুলো সুরক্ষা ও সুসংহত করা, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসৃষ্ট ক্ষতি থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই কারণে খাদ্যের অধিকার দানভিত্তিক নয়; বরং অধিকার, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. খাদ্যের অধিকারের মূল উপাদানগুলো কী?

খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার একটি মানবাধিকার। এ অধিকার বাস্তবায়নে খাদ্যকে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিসম্মত ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। খাদ্য টেকসইভাবে পাওয়া যেতে হবে এবং অর্থনৈতিক ও শারীরিকভাবে সবার নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। প্রতিটি মানুষের

সুস্থ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার আইনগত ও নৈতিক অধিকার রয়েছে।

মূল উপাদান	সংজ্ঞা	মূল বৈশিষ্ট্য	বিবেচ্য বিষয়
সহজলভ্যতা/ প্রাপ্যতা	খাদ্যের সহজলভ্যতা বলতে বোঝায় বছরের সব সময় প্রাকৃতিক উৎস থেকে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন (যেমন: চাষাবাদ, পশুপালন বা মাছ আহরণ) এবং বাজারে তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। এর অর্থ, খাদ্য এমনভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ করতে হবে যাতে তা সবসময় মানুষের হাতের নাগালে থাকে।	খাদ্য মানুষের হাতের নাগালে থাকা	চাষাবাদ, পশুপালন বা মাছ আহরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা
সুলভ ও সুগম/ প্রবেশগম্যতা	খাদ্য অধিকারের এই অংশটি অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। মূল্য বিবেচনায় খাদ্য সহজলভ্য হওয়া, বা খাদ্য কেনার জন্য যেন কোনো ব্যক্তি বা পরিবারকে তাদের অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন, যেমন: শিক্ষা বা চিকিৎসার ব্যয় বাদ দিতে না হয়। একই সঙ্গে, ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের কাছে যেন খাদ্য পৌঁছানো সহজ হয়, সেটাও নিশ্চিত করা জরুরি।	সাশ্রয়ী মূল্য এবং ভৌগোলিক সহজলভ্যতা	আয়, বাজার দর এবং পরিবহণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা
পর্যাপ্ততা	পর্যাপ্ত খাদ্য মানে কোনো ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, স্বাস্থ্য, পেশা এবং জীবনযাপনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও পরিমাণ নিশ্চিত করা। ব্যক্তি পর্যায়ের পাশাপাশি পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্যও এই পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা খাদ্য অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।	পুষ্টিগুণ এবং পরিমাণের ভারসাম্য	বয়স, পেশা এবং জীবনযাপনের ধরন। পর্যাপ্ত উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থা
স্থিতিশীলতা	স্থিতিশীলতা বলতে উপরের তিনটি স্তম্ভের ধারাবাহিকতা বা স্থায়িত্বকে বোঝায়। আকস্মিক কোনো সংকট বা কোনো ঘটনার কারণে মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি যেন ঝুঁকির মুখে না পড়ে। খাদ্যের যোগান এবং মূল্যের নির্ভরযোগ্যতাই হলো স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি।	আকস্মিক সংকট বা দুর্যোগে খাদ্যের ঝুঁকি মোকাবিলা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং খাদ্যমূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধি, প্রস্তুতি

৬. খাদ্যে প্রবেশাধিকার বলতে কী বোঝায়?

খাদ্যে প্রবেশাধিকার বলতে বোঝায়, মানুষ তার আর্থিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক সামর্থ্য ব্যবহার করে সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ বা ক্রয় করতে এবং তা গ্রহণ করতে পারছে কি না। বাজারে খাদ্য আছে তার মানে খাদ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়েছে, এমনটা নয়। প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের আয়, অবস্থান, শারীরিক সক্ষমতা, যোগাযোগব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষাকেও বিবেচনায় নিতে হয়।

অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্যের দাম এমন হতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য কিনতে গিয়ে পরিবারকে ওষুধ, বাসাভাড়া, শিক্ষা বা অন্য মৌলিক প্রয়োজন বাদ দিতে না হয়। মজুরি কম, আয় অনিয়মিত বা মূল্যস্ফীতি বেশি হলে খাদ্য বাজারে থাকলেও দরিদ্র মানুষ তা কিনতে পারে না। বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির পরিস্থিতি প্রতিবেদন- ২০২৬ অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বে ২.৬৯ বিলিয়নের বেশি মানুষের স্বাস্থ্যকর খাদ্য কেনার সামর্থ্য ছিল না।

খাদ্যে ভৌত বা ভৌগোলিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বাজার, খাদ্য বিতরণকেন্দ্র, জমি, নদী বা অন্যান্য খাদ্য উৎসে মানুষের জন্য সহজে পৌঁছানো সম্ভব হতে হবে। চর, হাওর, উপকূল, পাহাড়ি ও দুর্যোগে বিচ্ছিন্ন এলাকায় সড়ক, নৌযান, স্থানীয় গুদাম ও জরুরি পরিবহন যদি না থাকে, খাদ্য থাকলেও সেই খাদ্য তখন মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ ও বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য খাদ্যে ভৌত বা ভৌগলিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

অতএব, খাদ্যে প্রবেশাধিকার একই সঙ্গে আয়, মূল্য, জমি, কাজ, সামাজিক সুরক্ষা, অবকাঠামো ও বৈষম্যহীন সেবার প্রশ্ন।

৭. সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যের অধিকার কী?

সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যের অধিকার বলতে বোঝায় মানুষ এমন খাদ্য পাওয়ার অধিকার রাখে যা তার সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য, জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খাদ্যের অধিকার শুধু ক্যালরি বা পেট ভরানোর বিষয় নয়, মানুষের পরিচয় ও মর্যাদার সঙ্গেও যুক্ত। এর অর্থ হলো, নিতান্তই জরুরি পরিস্থিতি না হলে কোনো জনগোষ্ঠীকে তাদের রুচি, বিশ্বাস বা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। যেমন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত খাদ্য, ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী খাদ্য, বা স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য খাবারের প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে। ত্রাণ, স্কুলে খাবার বিতরণ, কারাগার, আশ্রয়কেন্দ্র বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির

ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই অধিকার গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে এক ধরনের খাদ্য সবার ওপর চাপিয়ে দিলে বৈষম্য তৈরি হতে পারে। তাই সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্য মানে সম্মানজনক, উপযোগী ও মানুষের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খাদ্য নিশ্চিত করা।

৮. খাদ্য সার্বভৌমত্ব কী এবং এটি খাদ্যের অধিকারের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত?

খাদ্য সার্বভৌমত্ব বলতে জনগণ, বিশেষ করে কৃষক ও ভোক্তাদের নিজেদের খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার বোঝায়। কী ধরনের খাদ্য উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদিত হবে, কোন বীজ, সার বা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং কীভাবে খাদ্য বাজারজাত করা হবে, এসব বিষয়ে স্থানীয় জনগণ ও কৃষকের অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি এতে অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা এবং দেশীয় কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাকে নীতিগত সুরক্ষা দেওয়া খাদ্য সার্বভৌমত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্যের অধিকার একে অপরের পরিপূরক। খাদ্যের অধিকার যেখানে মানুষের খাদ্য পাওয়ার আইনি ও মানবাধিকার ভিত্তিক নিশ্চয়তার কথা বলে, সেখানে খাদ্য সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ, খাদ্যের অধিকার খাদ্যের নিশ্চয়তা দেয়, আর খাদ্য সার্বভৌমত্ব সেই খাদ্য ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতাকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করে।

৯. মানুষের খাদ্যের অধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে এবং ক্ষুধা বা খাদ্যে প্রবেশাধিকার না থাকা কখন মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়?

খাদ্যমূল্য মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া, বাজারে মজুতদারি ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, খাদ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইত্যাদি মানুষের খাদ্যের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

কৃষিজমি, খাসজমি, জলাশয়, নদী, বন ও চরাঞ্চল থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ, কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি না থাকা, দুর্যোগে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুনর্বাসন না পাওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অনিয়মও এই অধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ।

কেউ ক্ষুধার্ত থাকা বা খাদ্যে প্রবেশাধিকার না পাওয়া সবক্ষেত্রে একই ধরনের আইনি লঙ্ঘন নয়। তবে রাষ্ট্রের প্রতিরোধযোগ্য ব্যর্থতা, বৈষম্যমূলক নীতি, অবহেলা, দুর্নীতি বা প্রয়োজনীয় সহায়তা

না দেওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, অপুষ্টি বা অনাহারে পতিত হলে খাদ্যের অধিকার ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১০. খাদ্যব্যবস্থা কী? খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য- ব্যবস্থার রূপান্তর কেন জরুরি?

খাদ্যব্যবস্থা হলো খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোগ ও খাদ্যবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত মানুষ, প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও কার্যক্রমের একটি পরস্পরসংযুক্ত ব্যবস্থা। এর প্রধান ধাপগুলো হলো বীজ ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, ভোগ এবং খাদ্যবর্জ্য পুনর্ব্যবহার বা অপসারণ। এই পুরো প্রক্রিয়া মানুষের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবিকা, সমাজ ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান খাদ্যব্যবস্থার অনেক অংশে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনের চেয়ে মুনাফা, একচেটিয়া বাজার ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পায়। ফলে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদিত হলেও ক্ষুদ্র কৃষক ন্যায্য মূল্য পান না, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন এবং দরিদ্র মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য কিনতে পারেন না। একই সঙ্গে বাজারে সস্তা কিন্তু কম পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের বিস্তার; অপুষ্টি ও খাদ্যজনিত রোগ বাড়ায়।

খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর বলতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার, বণ্টন ও ভোগের পদ্ধতিকে আরও ন্যায়সংগত, পুষ্টিসংবেদনশীল, পরিবেশবান্ধব ও সংকট-সহনশীল করে গড়ে তোলা বোঝায়। এতে ক্ষুদ্র কৃষক ও শ্রমিকের ন্যায্য আয়, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, বৈচিত্র্যময় ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং স্থানীয় বাজার ও সরবরাহব্যবস্থার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু দুর্যোগ, মহামারি, সংঘাত ও খাদ্যমূল্যের অস্থিরতার সময় স্থানীয় উৎপাদন, খাদ্য মজুত, সামাজিক সুরক্ষা এবং বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব কৃষি, জীববৈচিত্র্য, মাটি, পানি ও বীজের সুরক্ষা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যের অধিকার রক্ষা করে। তাই, খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তরের লক্ষ্য শুধু বেশি খাদ্য উৎপাদন নয়। এর লক্ষ্য হলো এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রত্যেক মানুষ মর্যাদার সঙ্গে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর, সাশ্রয়ী এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্য পেতে পারে।

১১. খাদ্য পরিবেশ কী এবং খাদ্যের দাম, প্রাপ্যতা, বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ব্যবস্থা মানুষের খাদ্য নির্বাচনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

খাদ্য পরিবেশ বলতে মানুষের চারপাশের সেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌত পরিস্থিতিকে বোঝায়, যা সে কোথা থেকে, কী দামে, কী ধরনের খাদ্য কিনবে, প্রস্তুত করবে এবং খাবে, তা প্রভাবিত করে। বাজারে কোন খাদ্য পাওয়া যায়, তার দাম কত, দোকান কত দূরে, খাবার কীভাবে সাজানো ও প্রচার করা হচ্ছে এবং সমাজে কোন খাবার জনপ্রিয়, এসবই খাদ্য পরিবেশের অংশ।

খাদ্যের দাম মানুষের খাদ্য নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলে। পুষ্টিকর খাদ্য, যেমন ফল, শাকসবজি, মাছ, ডিম ও দুধের দাম বেশি হলে নিম্নআয়ের পরিবার সস্তা কিন্তু কম পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবারের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। ফলে পেট ভরলেও প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত হয় না। আবার, কোনো এলাকায় যদি তাজা ও পুষ্টিকর খাদ্যের দোকান কম থাকে, কিন্তু ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয় ও অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার সহজে পাওয়া যায়, তাহলে মানুষের স্বাস্থ্যকর খাদ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। দোকানে চোখের সমান উচ্চতায়, প্রবেশমুখে বা টাকা পরিশোধের স্থানে মিষ্টি ও নোনতা খাবার সাজিয়ে রাখাও হঠাৎ কেনাকাটা বাড়াতে পারে।

বিজ্ঞাপন ও বিপণন মানুষের পছন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। খাবারকে আনন্দ, বিনোদন, সফলতা বা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করে প্রচার করলে মানুষ প্রকৃত ক্ষুধা বা পুষ্টির প্রয়োজনের চেয়ে বিজ্ঞাপনের প্রভাবে পণ্য কিনতে পারে। শিশু ও কিশোররা এতে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তারা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সবসময় বুঝতে পারে না।

১২. খাদ্যের অধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

খাদ্যের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। এর মূল ভিত্তি হলো খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ, এবং সহজলভ্যতার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের জন্য তার নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী নিরাপদ, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা। এই ধারণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, খাদ্য সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, ভোক্তা, উৎপাদক বা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তাই খাদ্যের অধিকারকে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি কেবল খাদ্যের প্রাপ্যতা নিয়ে কথা বলে না, বরং এর পেছনে থাকা অধিকার, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলোও তুলে ধরে।

অন্যদিকে, খাদ্য নিরাপত্তা মূলত খাদ্যের সহজলভ্যতা, সুলভ মূল্য এবং পর্যাপ্ততার ওপর জোর দেয়। এটি ক্ষুধা নিবারণের জন্য একটি কারিগরি সমাধানের মতো কাজ করে। খাদ্য নিরাপত্তার ধারণায়

বিষয়	খাদ্য অধিকার	খাদ্য নিরাপত্তা
ধারণার ধরন	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকারভিত্তিক ধারণা	মূলত উন্নয়ন ও কারিগরি/কৌশলগত ধারণা
মূল লক্ষ্য	প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা	মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য খাদ্য নিশ্চিত করা
দৃষ্টিভঙ্গি	অধিকারভিত্তিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি
অংশগ্রহণ	ভোক্তা, কৃষক ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়	সাধারণত সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টি কম গুরুত্ব পায়
জবাবদিহিতা	রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ	জবাবদিহিতার বিষয়টি সরাসরি কেন্দ্রীয় নয়
ফোকাস	খাদ্যের প্রাপ্যতা, প্রবেশাধিকার, পুষ্টি, সংস্কৃতির উপযোগিতা এবং মর্যাদা	খাদ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, সহজলভ্যতা ও সুলভ মূল্য
সম্পর্ক	একটি বিস্তৃত মানবাধিকারের কাঠামো	খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

সাধারণত ভোক্তা বা কৃষকের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি সরাসরি অনুপস্থিত থাকে। যদিও এই দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তারা প্রায়শই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। খাদ্যের অধিকার হলো একটি সামগ্রিক মানবাধিকারের কাঠামো, যা খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে আরও বিস্তৃত পরিসরে।

খাদ্যের অধিকার এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত হলেও এক নয়। এখানে মূল পার্থক্য হলো, খাদ্য নিরাপত্তা একটি পরিস্থিতি বা লক্ষ্য, কিন্তু খাদ্যের অধিকার একটি অধিকার কাঠামো। খাদ্য নিরাপত্তা বলবে খাদ্য পৌঁছাচ্ছে কি না। খাদ্যের অধিকার জিজ্ঞেস করবে, কে পাচ্ছে, কে পাচ্ছে না, কেন পাচ্ছে না, এবং রাষ্ট্রের দায় কোথায়। বাংলাদেশে এই পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধান উৎপাদন, খাদ্য মজুদ বা আমদানি পরিস্থিতি ভালো থাকলেও যদি দরিদ্র পরিবার সুষম খাবার কেনার সামর্থ্য না থাকে, শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, অথবা নগর শ্রমজীবীরা মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়, তবে খাদ্য নিরাপত্তার কিছু সূচক ভালো থাকলেও খাদ্যের অধিকার পূর্ণ হয় না। তাই খাদ্যের অধিকার খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও গভীর, ন্যায়ভিত্তিক ও আইনি অর্থ দেয়।

১৩. খাদ্যের অধিকার কি শুধু খাবার পাওয়া বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিনা মূল্যে খাবার পাওয়ার অধিকার?

খাদ্যের অধিকার শুধু খাবার হাতে পাওয়ার অধিকার নয় এবং এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র সব সময় সবাইকে বিনা মূল্যে খাবার দেবে। এর মূল কথা হলো, প্রতিটি মানুষ যেন কাজ, ন্যায্য আয়, জমি, পানি, উৎপাদন, বাজার ও সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে মর্যাদার সঙ্গে নিজের খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে।

রাষ্ট্রকে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে মানুষের নিজের প্রচেষ্টায় খাদ্য অর্জনের সুযোগ থাকে। তবে দুর্যোগ, সংঘাত, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, আটকাবস্থা, চরম দারিদ্র্য বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণে কেউ খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম হলে রাষ্ট্রকে সরাসরি খাদ্য, নগদ সহায়তা বা প্রয়োজনীয় সেবা দিতে হবে।

অতএব, খাদ্যের অধিকার মানুষের আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সরাসরি খাদ্য বিতরণ একটি জরুরি উপায়; কিন্তু তা অধিকার নয়।

১৪. খাদ্য সহায়তা কি খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান?

আর্থসামাজিক সংকট, দুর্যোগ, সংঘাত, বাস্তুচ্যুতি বা অন্য কোনো অসহায়ত্বের কারণে কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী নিজস্ব ব্যবস্থায় খাদ্যের ব্যবস্থা করতে না পারলে রাষ্ট্র, সমাজ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নৈতিক ও আইনগতভাবে খাদ্য সহায়তা দাবি করতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে খাদ্য সহায়তা মানুষের জীবন রক্ষা এবং তাৎক্ষণিক ক্ষুধা মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

তবে খাদ্য সহায়তা ও খাদ্যের অধিকার এক বিষয় নয়। খাদ্য সহায়তা সাধারণত সংকটাপন্ন ও খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম মানুষের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা। অন্যদিকে খাদ্যের অধিকার সব ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর জন্য সব সময় এবং সব পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য একটি সর্বজনীন মানবাধিকার। এর অর্থ হলো প্রত্যেক মানুষের পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যে নিয়মিত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

খাদ্য সহায়তা সংকটে জীবন রক্ষার জন্য জরুরি। তবে এটি খাদ্যের অধিকারের বিকল্প নয় এবং রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্বকে প্রতিস্থাপন করে না।

১৫. বিশ্বে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন হলেও মানুষ ক্ষুধার্ত কেন?

শুধু খাদ্য উৎপাদন বাড়ালেই ক্ষুধা দূর হয় না। বিশ্বে সামগ্রিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদিত হলেও দারিদ্র্য, আয়বৈষম্য, বেকারত্ব, সংঘাত, বাস্তুচ্যুতি, জলবায়ু বিপর্যয় এবং দুর্বল নীতির কারণে বহু মানুষ সেই খাদ্য পায় না। বাজারে খাদ্য থাকলেও অনেকের তা কেনার সামর্থ্য থাকে না। আবার কোথাও খাদ্য মজুত, বাজার কারসাজি, অন্যায্য বণ্টন বা দুর্বল পরিবহনব্যবস্থা মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত করে।

খাদ্যের অধিকার তাই শুধু কৃষি উৎপাদনের বিষয় নয়। খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না, তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে কি না, খাদ্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর কি না এবং সংকটের সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পাওয়া যাচ্ছে কি না, এসবও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

১৬. ক্ষুধা কেন রাজনৈতিক ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন?

ক্ষুধা দূর করতে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি, কৃষকের ন্যায্যমূল্য, বাজার নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং বৈষম্যহীন খাদ্য বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ ক্ষুধা খাদ্যের ঘাটতির পাশাপাশি প্রবেশাধিকার, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিরও প্রশ্ন। ক্ষুধা শুধু খাদ্যের অভাব নয়। অনেক সময় দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলেও দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্ব, জমি ও আয়ের অসম বণ্টন,

দুর্বল সামাজিক সুরক্ষা এবং ভুল নীতির কারণে মানুষ খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই, কে সম্পদ-সুযোগ ও সুরক্ষা পাচ্ছে- কে বঞ্চিত হচ্ছে তার উপরেও 'ক্ষুধা'র বিষয়টি নির্ভর করে। এ কারণে এটি একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন।

সরকারের কৃষি, মজুরি, খাদ্যমূল্য, সামাজিক সুরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাজার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত নীতি মানুষের খাদ্য পরিস্থিতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ন্যায্য ও কার্যকর নীতি ক্ষুধা কমায়, আর বৈষম্যমূলক ও দুর্বল নীতি ক্ষুধা বাড়ায়।

খাদ্য বঞ্চনা সব মানুষের ওপর সমানভাবে আসে না। নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নগর দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষ বেশি ঝুঁকিতে থাকে। বৈষম্যহীনতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে তাৎক্ষণিক দায়িত্ব। সামগ্রিক উৎপাদন বাড়লেও যদি প্রান্তিক মানুষের কাছে পুষ্টিকর খাদ্য না পৌঁছায়, তবে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়িত হয় না।

এই কারণে খাদ্যের অধিকার সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে যুক্ত। ন্যায্য মজুরি, সম্পদে সমান প্রবেশাধিকার, লক্ষ্যভিত্তিক সুরক্ষা, অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা ছাড়া ক্ষুধার কাঠামোগত কারণ দূর করা যায় না।

১৭. খাদ্যের অধিকার ও জীবনের অধিকার কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত?

খাদ্যের অধিকার ও জীবনের অধিকারের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা, সুস্থ থাকা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন সম্ভব নয়। খাদ্যের অভাব ক্ষুধা, অপুষ্টি, রোগ, শিশু মৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক ও দরিদ্র মানুষের ওপর এর প্রভাব আরও গুরুতর। তাই মানুষের জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

মানবাধিকারসমূহ অবিভাজ্য ও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত, কারণ একটি অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য অধিকারও দুর্বল হয়। খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। কাজ ও আয়ের সুযোগ না থাকলে খাদ্য ও বাসস্থানের নিরাপত্তা কমে যায়। তাই কোনো অধিকারকে আলাদা বা কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা যায় না। সব অধিকার একে অন্যকে শক্তিশালী করে এবং সেগুলো সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়।

১৮. খাদ্যের অধিকার অন্য মানবাধিকারের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত?

দারিদ্র্য মানুষের খাদ্য কেনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য এর চেয়েও বিস্তৃত। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, বাসস্থান, কাজ, জমি, সামাজিক সুরক্ষা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঘাটতি একসঙ্গে মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি দুর্বল করে।

খাদ্যের অধিকার মানুষের দারিদ্র্যকে শুধু আয় কম থাকার সমস্যা হিসেবে দেখে না। জমি ও সম্পদে অসমতা, কম মজুরি, অনিরাপদ কাজ, বাজারে বৈষম্য, নারীর সম্পদহীনতা, সামাজিক বর্জন এবং দুর্বল সেবাকে দারিদ্র্যের কাঠামোগত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। এসব কারণ পরিবর্তন না হলে সাময়িক আয় বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না।

খাদ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হ্রাস গুরুত্বপূর্ণ হলেও যথেষ্ট নয়। এজন্য একই সঙ্গে বৈষম্যহীন নীতি এবং কাঠামোগত সংকটের কার্যকর প্রতিকার প্রয়োজন ।

১৯. খাদ্যের অধিকারভিত্তিক ও চাহিদাভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী? খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

চাহিদাভিত্তিক পদ্ধতি খাদ্যকে প্রধানত মানুষের একটি প্রয়োজন হিসেবে দেখে এবং সহায়তার ওপর জোর দেয়। এতে মানুষকে সাধারণত সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি খাদ্যকে মানবাধিকার হিসেবে দেখে। এখানে মানুষ অধিকারধারী (Rightholder) এবং রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দায়িত্ববহনকারী বুঝানো হয়।

খাদ্যের অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি মানুষকে সহায়তার গ্রহীতা নয়, অধিকারধারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ, বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, ক্ষমতায়ন এবং জবাবদিহিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্বভিত্তিক পদ্ধতি রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ববাহক হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাদের ওপর অধিকারকে সম্মান করা, সুরক্ষা দেওয়া ও পূরণ করার বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে। দুটি পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কিত। অধিকারধারী দাবি উত্থাপন করেন এবং দায়িত্ববাহক আইন, নীতি, বাজেট, সেবা ও প্রতিকারের মাধ্যমে সেই দাবি বাস্তবায়ন করেন। অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি এসব খাতকে সমন্বিত করে এবং সংসদ, আদালত, মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, নাগরিক সমাজ ও জনগণের দায়িত্ব স্পষ্ট করে।

২০. শ্রম, কর্মসংস্থান ও ন্যায্য আয়ের অধিকার খাদ্যের অধিকারের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত?

কর্মসংস্থান না থাকার কারণে কোনো ব্যক্তি কর্মহীন বা বেকার হলে বা তাদের আয়ের ক্ষমতা কমে গেলে দরিদ্র অবস্থায় পতিত হয়। দারিদ্র্য সরাসরি মানুষের খাদ্য কেনার সামর্থ্যকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। পরিবারগুলো দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে প্রথমেই প্রয়োজনীয় ব্যয়গুলো, বিশেষ করে খাদ্যের পেছনে ব্যয়, সংকুচিত করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাদ্যের অধিকারের সঙ্গে বেকারত্বের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কটি প্রধানত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং খাদ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

বেকারত্বের কারণে খাদ্য কেনার সামর্থ্যের অভাব হলে মানুষ প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্য কেনার এই অক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টিহীনতা, শারীরিক দুর্বলতা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় যা শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

বেকারত্বের ফলে পরিবারে আয় কমে গেলে বা আয় না থাকলে সীমিত সম্পদ ও খাদ্য সরবরাহ নিয়ে বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যার

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে নারী ও শিশুর ওপর। বাংলাদেশের পারিবারিক চর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত প্রথমে পুরুষের খাবারের প্রয়োজন পূরণ করা হয়, নারীরা সবার শেষে খান। ফলে নারীর খাদ্যগ্রহণ কমে যায়। পরিবারগুলো পুষ্টি বিবেচনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মৌলিক ক্ষুধা নিবারণ করে বা করতে বাধ্য হয়। ফলে, প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব তৈরি হয়, যা শিশু ও নারীর স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২১. ভূমি, পানি ও সাধারণ সম্পদ খাদ্যের অধিকারের জন্য কেন জরুরি?

ভূমি, পানি, নদী, বন, জলাশয়, চর ও চারণভূমির মতো প্রাকৃতিক এবং সাধারণ সম্পদ মানুষের খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও জীবিকার প্রধান ভিত্তি। কৃষক জমিতে ফসল উৎপাদন করেন, জেলে নদী ও জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ করেন এবং বন ও চরনির্ভর মানুষ এসব সম্পদ ব্যবহার করে খাদ্য ও আয় নিশ্চিত করেন।

সাধারণ সম্পদ বলতে এমন সম্পদকে বোঝায়, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে যৌথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে। এসব সম্পদ দখল, দূষণ বা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে গেলে স্থানীয় মানুষ খাদ্য, আয় এবং জীবিকার উৎস হারায়। ভূমিহীনতা, অন্যায্য উচ্ছেদ, নদীভাঙন, লবণাক্ততা এবং পানির সংকটও খাদ্যের অধিকারকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এসব সম্পদে মানুষের ন্যায্য ও বৈষম্যহীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। উন্নয়ন বা বাণিজ্যিক প্রকল্পের কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থবহ পরামর্শ, পূর্বসম্মতি, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

২২. বর্তমান খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ধরন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যের অধিকার নির্ভর করে তারা পর্যাপ্ত জমি, উর্বর মাটি, নিরাপদ পানি, বীজ, জীববৈচিত্র্য ও স্থিতিশীল জলবায়ু পাবে কি না বা কতটা পাবে তার ওপর। কিন্তু বর্তমান খাদ্য উৎপাদনের অনেক পদ্ধতি অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার, বন ও জলাশয় ধ্বংস, নগরায়ন, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং মাটির অবক্ষয়ের মাধ্যমে এসব সম্পদ দ্রুত নষ্ট করছে। ফলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বর্তমান খাদ্যব্যবস্থা একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সারনির্ভর কৃষি, পশুপালন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও খাদ্যবর্জ্য থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের

নির্গমন বাড়লে খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, অতিরিক্ত তাপ ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত তীব্র হয়। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কম উৎপাদন, বেশি খাদ্যমূল্য এবং অনিশ্চিত খাদ্য সরবরাহের মুখোমুখি হবে।

অতিরিক্ত প্রাণিজ ও অতি-প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ভোগ, সম্পদের অসম ব্যবহার এবং বিপুল খাদ্য অপচয়ও জমি, পানি ও জ্বালানির ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যের অধিকার রক্ষার জন্য বর্তমান খাদ্যব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে আজকের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আগামী দিনের খাদ্য উৎপাদনের সম্পদ ও সক্ষমতা ধ্বংস না হয়। এজন্য টেকসই কৃষি, ন্যায়সংগত সম্পদ ব্যবহার, খাদ্য বৈচিত্র্য, কম অপচয় এবং পরিবেশসম্মত ভোগ নিশ্চিত করা জরুরি।

তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যের অধিকার রক্ষায় টেকসই ও বৈচিত্র্যময় কৃষি, মাটি ও পানি সংরক্ষণ, খাদ্য অপচয় কমানো, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, নগরায়ন সীমিত করা, ন্যায়সংগত সম্পদ বণ্টন এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। বর্তমান প্রজন্মের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তি নষ্ট করা যাবে না।

২৩. একাধিক পরিচয় কীভাবে খাদ্যবঞ্চনার ঝুঁকি বাড়ায়?

লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, বয়স, জাতিগত পরিচয় ও ভৌগোলিক অবস্থানসহ একাধিক পরিচয় ও বঞ্চনা একসঙ্গে যুক্ত হলে খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। লিঙ্গ, দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধিতা, বয়স, জাতিগত পরিচয় ও বসবাসের স্থান একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একই ব্যক্তিকে একাধিকভাবে বঞ্চিত করতে পারে। যেমন একজন দরিদ্র নারী কৃষক একজন দরিদ্র পুরুষ কৃষকের তুলনায় জমির মালিকানা, ঋণ, বাজার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমিত সুযোগ পাওয়ার কারণে খাদ্য উৎপাদন করেও নিজের পরিবারের জন্য অনেক সময়ই পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে পারেন না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কম আয় বা কর্মসংস্থানের অভাবের পাশাপাশি বাজারে যাওয়া, খাদ্য বহন, রান্না বা সহায়তা পাওয়ার বাধাও যুক্ত হতে পারে। শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বিশেষ পুষ্টির ব্যবস্থা, আর বয়স্ক মানুষের চলাচল, আয়, স্বাস্থ্য ও খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত হতে পারে।

আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভূমি দখল, বন ও জলাশয়ে প্রবেশাধিকার হারানো, পরিবেশের ক্ষতি এবং বৈষম্যের কারণে তাদের ঐতিহ্যগত খাদ্যব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

এতে তারা বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্য পাওয়ার সুযোগও কমে যায়। ভৌগোলিক অবস্থান এসব বঞ্চনাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। দুর্গম গ্রামীণ, চর, হাওর, পাহাড়ি বা উপকূলীয় এলাকায় বাজার, সড়ক, পরিবহন, সংরক্ষণ ও পুষ্টিসেবা দুর্বল হতে পারে। আবার শহরের নিম্নআয়ের এলাকায় তাজা ও পুষ্টিকর খাদ্যের তুলনায় সস্তা অতি-প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বেশি সহজলভ্য হতে পারে।

প্রত্যক্ষ বৈষম্য ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পরিচয় বা অবস্থানের কারণে সরাসরি কম সুবিধা দেওয়া হয়। পরোক্ষ বৈষম্য ঘটে যখন সবার জন্য একই নিয়ম প্রয়োগ করলেও বাস্তবে কোনো গোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তঃসংযোগমূলক বৈষম্য ঘটে যখন লিঙ্গ, দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধিতা, জাতিগত পরিচয় বা বাসস্থানের মতো একাধিক কারণ একসঙ্গে বঞ্চনা বাড়ায়।

২৪. খাদ্যের অধিকার কীভাবে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের আইনে স্বীকৃত?

খাদ্যের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মৌলিক মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৫ অনুচ্ছেদে খাদ্যকে পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মানের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের ১১ অনুচ্ছেদে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং ক্ষুধামুক্ত থাকার মৌলিক অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই অধিকার অনুযায়ী খাদ্য শুধু পরিমাণে যথেষ্ট হলেই হবে না। তা নিরাপদ, পুষ্টিকর, সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সব সময় শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রবেশযোগ্য হতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে খাদ্যকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন এবং ১৮ অনুচ্ছেদে পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে খাদ্যের অধিকার সরাসরি বিচারযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। এ কারণে স্পষ্ট আইন, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিকার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

২৫. খাদ্যের অধিকার সম্পর্কিত প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তি, ঘোষণা ও নির্দেশনাগুলো কী?

খাদ্যের অধিকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, ঘোষণা ও নীতিমালায় স্বীকৃত হয়েছে। প্রধান দলিলগুলো হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ।

এ ছাড়া ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণবিষয়ক ঘোষণা, বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের রোম ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, খাদ্যের অধিকারবিষয়ক এফএও ভলেন্টারি গাইডলাইন এবং কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়।

সব দলিল একইভাবে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। তবে অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক সনদ রাষ্ট্রের আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি

করে। ঘোষণা ও নির্দেশিকা সরাসরি আদালতে প্রয়োগযোগ্য না হলেও আইন, নীতি, বাজেট, পর্যবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি	অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রপক্ষের সংখ্যা*	খাদ্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট মূল ফোকাস বা গুরুত্ব
অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতকি চুক্তি (ICESCR)	১৭৩টি রাস্ট্র	খাদ্যের অধিকারকে পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মানের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পর্যাপ্ত খাদ্য, ক্ষুধা থেকে মুক্তি, খাদ্যের প্রাপ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা ও ক্রমান্বয় বাস্তবায়নের নীতি নির্ধারণ করে
শিশু অধিকার সনদ (CRC)	১৯৬টি রাষ্ট্র	শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, নিরাপদ পানি, অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জনে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ((CEDAW)	১৮৯টি দেশ	নারীদের পুষ্টি অধিকার, বিশেষ করে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের পর্যাপ্ত পুষ্টি, এবং গ্রামীণ নারীদের খাদ্য, জমি, উৎপাদনসম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়।

* সর্বশেষ তালিকা

খাদ্যের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত:

১. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (১৯৪৮)

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ২৫ নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে, “প্রত্যেক মানুষের খাদ্যসহ নিজের এবং তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান পাওয়ার অধিকার আছে ।”

২. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০)

খাদ্য ও পুষ্টি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মূল কেন্দ্রবিন্দু, যা প্রধানত এসডিজি ২ (ক্ষুধা মুক্তি) এর সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এই লক্ষ্যটির উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা দূর করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুষ্টির মান উন্নয়ন করা এবং টেকসই কৃষির প্রসার ঘটানো। আর পুষ্টি একটি বহুমুখী বিষয় হিসেবে ১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যের মধ্যে স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জলবায়ু কার্যক্রমসহ অন্তত ১২টি লক্ষ্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (১৯৬৬)

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির '১১ নম্বর অনুচ্ছেদে পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মানের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং প্রত্যেক মানুষের ক্ষুধামুক্ত থাকার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহকে নিজস্ব উদ্যোগে ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ধারা ২ অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে অধিকারসমূহের ক্রমান্বয়ে পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং বৈষম্যহীনভাবে এসব অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হয়েছে।

৪. ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (১৯৭৪)

এই সার্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক পুরুষ, নারী এবং শিশুর ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্ত থাকার এবং সম্পূর্ণরূপে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও তা বজায় রাখার অধিকার আছে।"

৫. বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত রোম ঘোষণা (১৯৯৬):

রোম ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১ এ বলা হয়েছে, "আমরা রাষ্ট্রও সরকার প্রধানরা বা আমাদের প্রতিনিধিরা এফএওর এর আমন্ত্রণে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে জড়ো হয়েছি যাতে প্রত্যেকের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রবেশগম্যতা, পর্যাপ্ত খাবার এবং ক্ষুধামুক্ত থাকার অধিকার পুনরায় নিশ্চিত হয়।"

৬. বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৬)

বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ৭.৪-এ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দলিলে স্বীকৃত পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং ক্ষুধামুক্ত থাকার মৌলিক অধিকারের বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উপায় হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের পূর্ণ ও ক্রমান্বয় বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭. শিশু অধিকারের ঘোষণা (১৯৫৯)

শিশু অধিকার ঘোষণার ৪, ৫ ও ৮ নং নীতিতে, "শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি, আবাসন, বিনোদন এবং চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার থাকবে এবং সকল পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ও ত্রাণ প্রাপ্তিতে শিশুর অগ্রাধিকার থাকবে।"

৮. সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং জরুরি অবস্থায় নারী ও শিশু সুরক্ষা ঘোষণাপত্র (১৯৭৪)

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, যে নারী ও শিশুরা যদি শান্তির লড়াইয়ে কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষে আটকে পড়েন, বা অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করেন, তাদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা বা অন্যান্য অবিচ্ছেদ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

৯. বিশ্ব কর্মসংস্থান সম্মেলন (১৯৭৬)

ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট কনফারেন্সের কর্মসূচির অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী, "এই কর্মসূচিতে মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে দুটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমত, পরিবারের ব্যক্তিগত ভোগের ন্যূনতম চাহিদা, যার মধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্য অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য সেবা, যার মধ্যে নিরাপদ খাবার পানি অন্তর্ভুক্ত।"

১০. বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (১৯৭৭)

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির চতুর্থ বিধিতে বলা হয়েছে বিশেষ করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে খাদ্য একটি সহযোগিতা। অভাবগ্রস্ত দেশগুলোতে গৃহীত প্রকল্পের উপর এখানে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র সাথে সমন্বয়ে জরুরি খাদ্য সহায়তা এবং বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রচারের কথা উল্লেখ করা হয়।

১১. কৃষি সংস্কার ও গ্রামীণ উন্নয়ন বৈশ্বিক সম্মেলনে নীতিমালার ঘোষণা (১৯৭৯)

ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১(৭) এ বলা হয়েছে, "দারিদ্র, ক্ষুধা এবং অপুষ্টি জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে এবং সমাজ ও অর্থনীতির বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত

করে এই বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা’। অনুচ্ছেদ ১(১৪) তে বলা আছে, ‘একটু নূতন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশল তৈরীতে জাতিসংঘের দায়িত্ব রয়েছে এবং এই নূতন কৌশলের খাদ্য সংশ্লিষ্ট সেই অংশগুলোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে।’

১২. আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যের নৈতিকতাবিধির কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিস কমিশন (১৯৭৯)

কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিস কমিশন স্বীকৃত করে যে জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের জন্য জীবিকা/ জীবনযাত্রার গ্রহণযোগ্য মান অর্জনে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, মানসম্মত এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২(১) এ বলা হয়েছে, ‘এই বিধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্তভুর্ক্ত সকল খাদ্যের জন্য প্রযোজ্য’ এবং অনুচ্ছেদ ২(২) এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োগের জন্য এই বিধি নৈতিক আচরণের মানদণ্ড স্থাপন করে’।

১৩. পুষ্টি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং পুষ্টি সম্পর্কিত বৈশ্বিক ঘোষণাপত্র (১৯৯২)

এই ঘোষণায় খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ‘মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষোনাপত্রে থাকা খাদ্যের অন্তর্ভূক্তিসহ স্বচ্ছল/মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকারের কথা মাথায় রেখে, ক্ষুধামুক্তিকে বাস্তব রূপদানে আমরা একই সংহতিতে কাজ করার অঙ্গীকার করছি’।

এছাড়া, জেনেভা সনদের ধারা ৫৫ তে খাদ্যের অধিকার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি ও জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটিতেও এ বিষয়ে বিবরণ রয়েছে।

২৬. আন্তর্জাতিক আইনে খাদ্যের প্রাপ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা ও

আন্তর্জাতিক আইনে খাদ্যের অধিকার ব্যাখ্যা করতে খাদ্যের প্রাপ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা ও উপযুক্ততা তিনটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। জাতিসংঘ বলছে “খাদ্যের অধিকার

উপযুক্ততার ধারণা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

তখনই বাস্তবায়িত হয় যখন প্রত্যেক মানুষ সব সময় পর্যাপ্ত খাদ্য বা তা অর্জনের উপায়ে পৌঁছতে পারে। খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে বোঝায় পর্যাপ্ত খাদ্য বিদ্যমান থাকা। এটি হতে পারে নিজস্ব উৎপাদন, কৃষিজমি, মৎস্য, প্রাকৃতিক সম্পদ বা কার্যকর বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে। অর্থাৎ খাদ্য বাস্তবে থাকতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৌঁছাতে হবে। প্রবেশযোগ্যতা বলতে বোঝায় মানুষ যেন খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।" এর দুটি দিক আছে, অর্থনৈতিক প্রবেশযোগ্যতা এবং শারীরিক প্রবেশযোগ্যতা। খাদ্যের দাম এমন হতে হবে যাতে মানুষ খাদ্য কিনে অন্য মৌলিক চাহিদা থেকেও বঞ্চিত না হয়। একই সঙ্গে শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য খাদ্যে পৌঁছানো সম্ভব হতে হবে। উপযুক্ততা বলতে বোঝায় খাদ্য শুধু পরিমাণে যথেষ্ট হলেই হবে না, তা পুষ্টিকর, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সংস্কৃতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি থাকতে হবে এবং তা মানুষের স্বাস্থ্য, বয়স, জীবনচক্র ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২৭. জাতিসংঘের খাদ্যের অধিকার বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা (সাধারণ মন্তব্য নং ১২) তে খাদ্যের অধিকারের গুরুত্ব কী?

জাতিসংঘের খাদ্যের অধিকার বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা, সাধারণ মন্তব্য নং ১২, হলো ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটি কর্তৃক গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত দলিল। এটি অর্থরৈতিক, সামাজকি ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদের ১১নং অনুচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে গৃহিত একটি প্রামান্য দলিল, যা রাষ্ট্রগুলোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার রীপরেখা প্রদান করে।

এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, খাদ্যের অধিকার শুধু ক্যালরি পাওয়ার অধিকার নয়। প্রত্যেক মানুষ যেন সব সময় শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যে প্রবেশাধিকার পায়, অথবা তা অর্জনের উপায় পায়, সেটিই খাদ্যের অধিকার। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্যের স্থায়িত্বও অন্তর্ভুক্ত। এতে রাষ্ট্রের তিনটি মূল দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সম্মান করা, অর্থাৎ মানুষের বিদ্যমান খাদ্যপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত না করা। সুরক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ যেন খাদ্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। বাস্তবায়নে সহায়তা করা, অর্থাৎ নীতি, কর্মসূচি, সামাজিক সুরক্ষা ও প্রয়োজনে সরাসরি খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে অধিকার নিশ্চিত করা।

২৮. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও খাদ্য অধিকারবিষয়ক ভলান্টারি গাইডলাইন কী এবং এর আইনি অবস্থান কী?

খাদ্যের অধিকার বিষয়ক ভলেন্টারি গাইডলাইনটি জাতিসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির (সিএফএস)-র ৩০তম অধিবেশনে অনুমোদিত হয় এবং ২০০৪ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ১২৭তম অধিবেশনে 'জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নে সহায়ক স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা' (Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security) গৃহীত হয়। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ক্রমান্বয়ে পূর্ণ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে দিকনির্দেশনা দিতে এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়। এটি প্রণয়নে নাগরিক সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে এটি মানবাধিকার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তব নির্দেশিকা হিসেবে এটি রাষ্ট্রসমূহ বা সরকার ব্যবহার করতে পারে। যদিও এই নির্দেশিকাটি রাষ্ট্র বা সরকারের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়, তবে খাদ্যের অধিকার সুরক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদ, শিক্ষা, আইন এবং বাজার সুবিধাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য অংশীজনদের জন্য এখানে নীতি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্যের অধিকার বিষয়ক ভলান্টারি গাইডলাইন হলো:

১. গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার ও আইনের শাসন: একটি শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক সমাজ নিশ্চিত করা যেখানে মানুষ মর্যাদার সাথে নিজের এবং পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি: খাদ্য নিরাপত্তা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৩. কৌশল: খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য মানবাধিকার-ভিত্তিক জাতীয় কৌশল গ্রহণ করার মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করে।

৪. বাজার ব্যবস্থা: কৃষি ও খাদ্য বাজারের কার্যকারিতা উন্নত করা এবং বাজার ব্যবস্থায় বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করা।

৫. প্রতিষ্ঠান: সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংস্কার করা যাতে তারা খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. অংশীজন: সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭. আইনি কাঠামো: জাতীয় আইন বা সংবিধানে খাদ্যের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা।

৮. সম্পদ ও সম্পত্তিতে প্রবেশাধিকার: ভূমি, পানি, বন, মৎস্য এবং প্রাণ সম্পদে সাধারণ মানুষের টেকসই ও বৈষম্যহীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
৯. খাদ্য নিরাপত্তা ও ভোক্তা সুরক্ষা: স্থানীয় বা আমদানিকৃত খাদ্য নিরাপদ কি না তা নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা।
১০. পুষ্টি: স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা এবং পুষ্টির মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
১১. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্যের অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
১২. জাতীয় আর্থিক সম্পদ: খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
১৩. ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য সমর্থন: যারা খাদ্যহীনতার ঝুঁকিতে আছে তাদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সহায়তা করা এবং তাদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১৪. সামাজিক সুরক্ষা: যারা খাবার জোগাতে অক্ষম তাদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
১৫. আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা: আন্তর্জাতিক সহায়তা যেন সহায়তা গ্রহণকারী দেশের উৎপাদন ব্যাহত না করে এবং জাতীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা।
১৬. প্রাকৃতিক ও মনবসৃষ্ট দুর্যোগ: সংকটের সময় বা দুর্যোগে মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
১৭. তদারকি, সূচক ও মাইলফলক: নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের সঠিক সূচক বা ইন্ডিকেটর এবং তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
১৮. জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা: মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে খাদ্যের অধিকার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া।
১৯. আন্তর্জাতিক মাত্রা: আন্তর্জাতিক স্তরে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করা এবং টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক সহযোগিতা বজায় রাখা ।

২৯. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা ও প্রতিকার ব্যবস্থাগুলো কী কী?

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘনের জন্য কয়েকটি জবাবদিহিতা ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো দেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির সদস্য হলে তাকে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দিতে হয়, যেখানে ক্ষুধা, পুষ্টি, খাদ্যে প্রবেশাধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার অবস্থা

পর্যালোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক কমিটি এসব প্রতিবেদন পরীক্ষা করে এবং রাষ্ট্রকে সুপারিশ দেয়। নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলোও বিকল্প প্রতিবেদন দিয়ে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে পারে। এছাড়া জাতিসংঘের সর্বজনীন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং খাদ্যের অধিকারবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক বিভিন্ন দেশের অবস্থা মূল্যায়ন করেন ও পরামর্শ দেন। প্রতিকারের অংশ হিসেবে ভুক্তভোগীদের বিচার পাওয়ার সুযোগ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে; পাশাপাশি নীতি সংশোধন এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের লঙ্ঘন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩০. কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে শক্তিশালী করে?

কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী খাদ্য উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তারা প্রায়ই জমি, পানি, বীজ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ঋণ, বাজার ও ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। জাতিসংঘের এই ঘোষণা কৃষক, কৃষিশ্রমিক, জেলে, পশুপালক এবং অন্যান্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এসব সম্পদ সুযোগে ন্যায্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ঘোষণাটি কৃষকের খাদ্য, ভূমি, পানি, বীজ, জীবিকা, ন্যায্য আয়, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। এটি অন্যায় উচ্ছেদ, জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখল এবং কৃষকের নিজস্ব বীজ ব্যবহারে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষার কথাও বলে। কৃষকের উৎপাদনের ভিত্তি সুরক্ষিত হলে তারা নিজেদের খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্য মানুষের জন্যও খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। এভাবেই ঘোষণাটি খাদ্যের অধিকারকে শক্তিশালী করে।

৩১. রাষ্ট্রের ন্যূনতম মূল বাধ্যবাধকতা, ধারাবাহিক বাস্তবায়ন এবং পশ্চাদপসরণমূলক পদক্ষেপ বলতে কী বোঝায়?

রাষ্ট্রের ন্যূনতম মূল বাধ্যবাধকতা হলো, নাগরিকদের জন্য অন্তত এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে কেউ ক্ষুধা ও অনাহারে না থাকে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও রাষ্ট্রকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য জরুরি খাদ্য, নিরাপদ পানি, পুষ্টিসেবা এবং মৌলিক সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়।

ধারাবাহিক বাস্তবায়ন মানে হলো, রাষ্ট্র বাস্তবসম্মত সময়ের মধ্যে আইন, নীতি, বাজেট ও কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্যের অধিকার ক্রমে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে। তবে বৈষম্য দূর করা, ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সৃষ্টি না করা এবং ন্যূনতম খাদ্য নিশ্চিত করার মতো দায়িত্ব তাৎক্ষণিক পালন করতে হবে ।

রাষ্ট্র কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বিদ্যমান খাদ্য, পুষ্টি বা সামাজিক

সুরক্ষা সুবিধা হ্রাস করতে পারে না। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে যে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো বিবেচনা করা হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং উপলব্ধ সর্বোচ্চ সম্পদ ন্যায্য ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩২. খাদ্যকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা কেন যুদ্ধাপরাধ, এবং এই নিষ্ঠুর কৌশল কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর দীর্ঘমেয়াদি মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে?

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে বেসামরিক মানুষকে অনাহারে রাখা যুদ্ধের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধানের ৮(২)(খ)(২৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতে বেসামরিক মানুষকে অনাহারে রাখার উদ্দেশ্যে খাদ্য, পানি ও জীবনধারণের অপরিহার্য উপকরণ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা এবং মানবিক ত্রাণ সরবরাহ জেনেশুনে বাধাগ্রস্ত করা যুদ্ধাপরাধ। রোম সংবিধানের মূল পাঠে এই অপরাধটি শুধু আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০১৯ সালে গৃহীত সংশোধনীর মাধ্যমে ৮(২)(ঙ)(১৯) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতেও একই ধরনের ইচ্ছাকৃত অনাহারকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংশোধনীটি ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর কার্যকর হয়েছে, তবে সংশোধনী গ্রহণকারী রাষ্ট্রপক্ষগুলোর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নির্ভর করে রোম সংবিধানের সংশোধনী ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারিক এখতিয়ারের শর্তের ওপর। এই অপরাধের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বা সরবরাহব্যবস্থা ধ্বংস করা, খাদ্যগুদাম ও পানির উৎস নষ্ট করা, কৃষিজমি ব্যবহার অসম্ভব করে দেওয়া অথবা প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে দেওয়ার মতো কাজ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যখন এসব কাজের উদ্দেশ্য বেসামরিক মানুষকে অনাহারে রাখা। তবে সংঘাতের কারণে খাদ্য সরবরাহে যে কোনো বিঘ্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুদ্ধাপরাধ নয়। অপরাধ প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা, জ্ঞান, কাজের পরিস্থিতি এবং রোম সংবিধানে নির্ধারিত অপরাধের উপাদানগুলো বিবেচনা করতে হয়।

এর ক্ষতি তাৎক্ষণিক ক্ষুধা ও মৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গর্ভবতী নারী ও শিশু দীর্ঘদিন অপুষ্টিতে থাকলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং আজীবন স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। কৃষিজমি, বীজ, সেচব্যবস্থা, গবাদিপশু, বাজার ও পরিবহন অবকাঠামো ধ্বংস হলে সংঘাত শেষ হওয়ার পরও বহু বছর খাদ্য উৎপাদন ও জীবিকা পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয়। এ কারণেই মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে রাখা বর্তমান মানুষের জীবন ও মর্যাদার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও

অধ্যায়- ২

কীভাবে খাদ্যের অধিকার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়?

৩৩. ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্যের অধিকার কীভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে?

ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্যের অধিকার নানা কারণে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। অনেক সময় তাদের চাষযোগ্য জমি কম থাকে, সেচ, বীজ, সার, ঋণ ও প্রযুক্তিতে পর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার থাকে না। ফলে উৎপাদন কম হয় এবং নিজের পরিবারের খাদ্য চাহিদাও ঠিকমতো পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ন্যায্য দাম না পাওয়া, বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব, ঋণের চাপ এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি তাদের আয় কমিয়ে দেয়। এতে খাদ্য কেনার সক্ষমতাও কমে যায়। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেও ক্ষুদ্র কৃষক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফসল নষ্ট হলে তারা দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে। তাই ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্যের অধিকার রক্ষায় জমির নিরাপত্তা, কৃষি সহায়তা, ন্যায্য বাজারদর, সামাজিক সুরক্ষা এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষিনীতি জরুরি।

৩৪. ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তাদের নিজস্ব জমি না থাকায় তারা খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে তারা প্রধানত দিনমজুরি, অস্থায়ী কাজ বা কম আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়, যা নিয়মিত খাদ্য জোগার নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নাও হতে পারে। কাজের অভাব, মৌসুমি বেকারত্ব, কম মজুরি বা হঠাৎ আয় বন্ধ হয়ে গেলে তাদের খাদ্য কেনার সক্ষমতা দ্রুত কমে যায়। এতে পরিবারে অপুষ্টি, ঋণগ্রস্ততা এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে। অনেক ভূমিহীন পরিবার বাসস্থান অনিশ্চয়তা, উচ্ছেদ ঝুঁকি, সামাজিক সুরক্ষায় কম প্রবেশাধিকার এবং দুর্যোগের সময় বেশি ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে খাদ্যের অধিকার আরও দুর্বল হয়।

৩৫. বাজারনির্ভর খাদ্য ব্যবস্থায় শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার কীভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে?

বাজারনির্ভর খাদ্য ব্যবস্থায় শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার নানাভাবে ঝুঁকিতে পড়ে, কারণ তারা সাধারণত নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাজার থেকে খাদ্য কিনে জীবনধারণ করে। তাদের আয় কম, অনিয়মিত বা দৈনিক মজুরিনির্ভর হওয়ায় খাদ্যের দাম বাড়লে বা কাজ বন্ধ হলে ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত কমে যায়।

এ অবস্থায় পরিবারগুলো প্রথমে খাবারের পরিমাণ কমায়, পরে পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্তে কম দামি ও নিম্নমানের খাদ্য বেছে নেয়। মজুতদারি, সরবরাহ সংকট, বাজার অস্থিরতা ও মূল্যস্ফীতি তাদের খাদ্যপ্রাপ্তি আরও কঠিন করে তোলে। ফলে অপুষ্টি, ঋণগ্রস্ততা, অসুস্থতা এবং শিশু ও নারীর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে।

বস্তি ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানি, রান্নার জায়গা, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রাপ্যতাও সীমিত থাকে। তাই শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে নিয়মিত আয়ের সুযোগ, ন্যায্য মজুরি, খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বাজার তদারকি, সামাজিক সুরক্ষা এবং সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর খাদ্য কর্মসূচি প্রয়োজন।

৩৬. অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা কেন দুর্বল?

অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা দুর্বল, কারণ তাদের আয় সাধারণত কম, অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত। দৈনিক মজুরি বা অস্থায়ী কাজের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কাজ বন্ধ হলে বা আয় কমে গেলে খাদ্য কেনার সক্ষমতা দ্রুত কমে যায়। এদের অনেকের চাকরির স্থায়িত্ব নেই, অসুস্থতা ছুটি নেই, বীমা নেই এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা সীমিত। ফলে হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বাজারদর বৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক সংকটে তারা দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে। অনেক অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবী পরিবার নিম্নমানের বাসস্থানে থাকে, যেখানে নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ, রান্না বা বিশুদ্ধ পানির সুবিধাও সীমিত। এতে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়ে।

৩৭. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার কীভাবে আলাদা মাত্রা ধারণ করে?

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর খাদ্য শুধু পুষ্টি বা জীবিকার বিষয় নয়, এটি ভূমি, বন, নদী, সংস্কৃতি, পরিচয় এবং ঐতিহ্যগত জীবনব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় শিকার, মাছ ধরা, জুমচাষ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও স্থানীয় বীজভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাদের খাদ্যের অধিকার মানে প্রাকৃতিক সম্পদে নিরাপদ ও অবাধ প্রবেশাধিকার। যখন ভূমি দখল, বন উচ্ছেদ, পানির উৎস ধ্বংস, খনি প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তন বা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ঘটে, তখন শুধু আয় নয়, তাদের খাদ্যব্যবস্থা ও সংস্কৃতি উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে খাদ্যের অধিকার বিশেষভাবে হুমকির মুখে পড়ে। তাই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে জমি ও সম্পদের অধিকার, মুক্ত ও পূর্বসম্মতি, সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী খাদ্যনীতি এবং বৈষম্যহীন সেবা নিশ্চিত করা জরুরি।

আদিবাসীদের জন্য খাদ্য মানে শুধু বাজার থেকে কেনা খাবার নয়, বরং তাদের ঐতিহ্যগত জীবনব্যবস্থা বজায় রেখে খাদ্য অর্জনের অধিকার। তাই বন ও প্রাকৃতিক সম্পদে ন্যায্য প্রবেশাধিকার তাদের খাদ্যের অধিকার রক্ষার মৌলিক শর্ত।

৩৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে বাস্তুচ্যুতি কীভাবে মানুষের খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করে?

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নগরায়ন বা উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে মানুষ বাস্তুচ্যুত হলে তাদের জমি, ঘর, জীবিকা, খাদ্য উৎপাদনের উপায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার হারিয়ে যেতে পারে। বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, খরা বা ভূমিধসের কারণে কৃষিজমি, ফসল, গবাদিপশু, মাছ ধরার স্থান ও পানির উৎস নষ্ট হলে মানুষের খাদ্য ও জীবিকার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

একইভাবে সড়ক, বাঁধ, খনি, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন বা অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি, বন, নদী বা জলাশয় অধিগ্রহণ, আন্তর্জাতিক সীমানায় নিরাপত্তা হুমকিজনিত নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি কারণে স্থানীয় মানুষ তাদের ঐতিহ্যগত খাদ্যের উৎস হারাতে পারে। আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই ক্ষতি আরও গুরুতর, কারণ তাদের খাদ্যব্যবস্থা প্রায়ই জুমচাষ, বনজ সম্পদ, মাছ ধরা, স্থানীয় বীজ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল।

ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পূর্বপরামর্শ, সম্মতি, পুনর্বাসন এবং বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না থাকলে বাস্তুচ্যুত মানুষ বাজারনির্ভর হয়ে পড়ে। আয় কমে গেলে তারা পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য কিনতে পারে না। ফলে অপুষ্টি, ঋণগ্রস্ততা, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা বাড়ে। তাই বাস্তুচ্যুতি শুধু বাসস্থান হারানোর বিষয় নয়। এটি মানুষের খাদ্য, জীবিকা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং মর্যাদার অধিকারকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩৯. নারীর খাদ্যের অধিকার কেন আলাদাভাবে গুরুত্ব পায়? ভূমি, সম্পদ, পরিবার এবং পরিচর্যার কাজে বৈষম্য কীভাবে নারীর খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে?

নারীর খাদ্যের অধিকার বিশেষভাবে বিবেচ্য, কারণ খাদ্য উৎপাদন, রান্না, পানি সংগ্রহ, শিশু ও বয়স্কের যত্ন এবং পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নারীর বড় ভূমিকা থাকলেও তারা প্রায়ই আয়, জমি, ঋণ, কৃষি উপকরণ, বাজার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অধিকার পায় না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায়ও নারীর খাদ্যগ্রহনে কম গুরুত্ব দেখা যায়।

অনেক নারী অনানুষ্ঠানিক বা কম মজুরির কাজে যুক্ত থাকেন এবং বিপুল পরিমাণ অবৈতনিক পরিচর্যা শ্রম করেন। এতে আয়মূলক কাজ, বিশ্রাম ও নিজের পুষ্টির জন্য সময় কমে যায়। অনেক পরিবারে নারী অন্য সদস্যদের আগে খাবার দেন এবং নিজেরা পরে বা কম পুষ্টিকর খাবার খান।

কৈশোর, গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানের সময় নারীর বাড়তি পুষ্টির প্রয়োজন হয়। এই পুষ্টির চাহিদা পূরণ না হলে রক্তস্বল্পতা, অপুষ্টি ও অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ে। এতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টি পরিস্থিতিও ঝুঁকির মুখে পড়ে।

৪০. শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার কেন বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন? অপুষ্টি কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে দারিদ্র্য তৈরি করে?

শিশুরা নিজেরা আয় করতে বা খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পুষ্টির ওপর সরাসরি নির্ভর করে। তাই শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিশেষভাবে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টি শিশুর উচ্চতা, মস্তিষ্কের বিকাশ, শেখার ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে শিক্ষা ও আয়ের সুযোগ কমে এবং দারিদ্র্য ও অপুষ্টির প্রজন্মান্তর চক্র তৈরি হয়।

রাষ্ট্রকে মাতৃ ও শিশুপুষ্টি, বুকের দুধ খাওয়ানোর সহায়তা, পরিপূরক খাদ্য, টিকাদান, অপুষ্টি শনাক্ত ও চিকিৎসা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য, সামাজিক সুরক্ষা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শিশুদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

সেবা ও তথ্য বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা ও অঞ্চল অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে কোনো শিশু বাদ না পড়ে।

৪১. বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কী ভূমিকা রাখে?

বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি শিশুদের নিয়মিত, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য এটি অনেক সময় দিনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খাবার হয়ে ওঠে। এই কর্মসূচি বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ায়, ঝরে পড়া কমায় এবং শেখার সক্ষমতা উন্নত করে। ক্ষুধার্ত শিশুদের মনোযোগ কম থাকে, তাই স্কুলে খাবার দিলে শিখন সক্ষমতাও শক্তিশালী হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি অপুষ্টি কমাতে, কিশোরী মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে এবং জরুরি সময়ে সামাজিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করতে পারে। বিদ্যালয়ভিত্তিক স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা হলে স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হয়। তাই এটি খাদ্য, শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার কার্যকর উপায়।

৪২. শিশুশ্রম ও খাদ্যের অধিকারের সম্পর্ক কী?

শিশুশ্রম ও খাদ্যের অধিকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনেক পরিবার দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা খাদ্য অনিরাপত্তার কারণে শিশুদের কাজে পাঠায়, যাতে পরিবারের আয় বাড়ে এবং খাবার জোগাড় করা যায়। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত না হওয়াই শিশুশ্রমের একটি কারণ। অন্যদিকে শিশুশ্রম নিজেও খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করে। শ্রমে যুক্ত শিশুরা প্রায়ই দীর্ঘ সময় কাজ

করে, কম মজুরি পায়, পুষ্টিকর খাদ্য পায় না এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। এতে তাদের বৃদ্ধি, শিক্ষা ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুশ্রম শিশুদের বিদ্যালয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে ভবিষ্যতে ভালো আয় ও নিরাপদ জীবিকার সুযোগ কমে যায়। এতে দারিদ্র্য ও খাদ্য অনিরাপত্তার চক্র চলতেই থাকে। তাই শিশুশ্রম প্রতিরোধ করতে হলে খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করাও জরুরি; কারণ এই দুটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৪৩. রোহিঙ্গা, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা উচিত?

রোহিঙ্গা, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার মানবিক মর্যাদা ও বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আইনি অবস্থান বা নাগরিকত্বের অভাব খাদ্য, নিরাপদ পানি, পুষ্টি ও জরুরি সেবা থেকে বঞ্চিত করার কারণ হতে পারে না। আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়মিত আয়, কৃষি ও বাজারে প্রবেশের সুযোগ সীমিত থাকায় পর্যাপ্ত ও ধারাবাহিক মানবিক অর্থায়ন প্রয়োজন। খাদ্য সহায়তার পরিমাণ মূল্যস্ফীতি ও পরিবারের আকার অনুযায়ী সমন্বয় করতে হবে এবং শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করতে হবে।

সহায়তা কমে গেলে শুধু খাদ্যের পরিমাণ নয়, খাবারের বৈচিত্র্য ও পুষ্টিমানও কমে যায়। তাই দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, স্বচ্ছ উপকারভোগী তালিকা, সুষ্ঠু ও সহজ বিতরণ ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ ব্যবস্থা, স্থানীয় বাজারের সুরক্ষা এবং আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় জরুরি।

৪৪. প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ মানুষের বিশেষ খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা কীভাবে পূরণ করা উচিত?

প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে শুধু সাধারণ খাদ্য সহায়তা যথেষ্ট নয়। অনেকের বিশেষ খাদ্য, সহায়ক যন্ত্র, বিশেষ যত্ন, পরিচর্যা, চিকিৎসা এবং খাবার সংগ্রহ বা রান্নায় সহায়তা প্রয়োজন হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, চলাচলের সমস্যা, তথ্যের অপ্রাপ্যতা, ডিজিটাল নিবন্ধনের জটিলতা বা পরিবারে বৈষম্যের কারণে তারা সামাজিক সুরক্ষা ও খাদ্য বিতরণ থেকে বাদ পড়তে পারেন। তাই ঘরে পৌঁছে দেওয়া সেবা, প্রবেশগম্য বিতরণকেন্দ্র, প্রতিনিধির মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ, সহজ তথ্য, পুষ্টি পরামর্শ, পরিচর্যাকারীর সহায়তা এবং অভিযোগের সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪৫. হাওর, চর, উপকূল ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার কেন বিশেষ সুরক্ষা দাবি রাখে ?

হাওর, চর, উপকূল, পাহাড় ও দুর্গম এলাকার মানুষের খাদ্যের অধিকার বিশেষভাবে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এসব এলাকায় মৌসুমি বেকারত্ব, বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, যোগাযোগের সমস্যা এবং বাজারে বেশি দামের মতো সমস্যা একসঙ্গে দেখা যায়।

দেশে খাদ্য পর্যাপ্ত থাকলেও এসব এলাকায় অনেক সময় খাবার ঠিকভাবে পৌঁছায় না। স্থানীয় বাজার, রাস্তা, নৌপথ বা গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে কৃষক, জেলে ও দিনমজুরেরা একসঙ্গে উৎপাদন, আয় এবং সম্পদ হারাতে পারেন। তাই এসব এলাকার জন্য স্থানীয় খাদ্য মজুত, নৌ ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা, আগাম সতর্কতা, আগাম অর্থ সহায়তা, মৌসুমি সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, নিরাপদ পানি এবং অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ পরিকল্পনা প্রয়োজন।

অধ্যায়- ৩

রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য পক্ষের দায়িত্ব

৪৬. খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের সামগ্রিক আইনি বাধ্যবাধকতা কী এবং সম্মান, সুরক্ষা ও পূরণের দায়িত্ব কীভাবে কাজ করে?

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত; সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রবেশাধিকার, ক্ষুধামুক্তির প্রতি সম্মান, সুরক্ষা প্রদান এবং তা পূরণ করা।

সম্মান করার অর্থ রাষ্ট্র এমন কোনো আইন, নীতি বা পদক্ষেপ নেবে না, যা মানুষের বিদ্যমান খাদ্য, জীবিকা, জমি, পানি, নদী, বন বা বাজারে প্রবেশের সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যায় উচ্ছেদ, বৈষম্যমূলক নিষেধাজ্ঞা বা খাদ্য উৎপাদনের উৎস বন্ধ করা এই বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন হতে পারে।

সুরক্ষা দেওয়ার অর্থ ব্যক্তি, কোম্পানি বা অন্য কোনো পক্ষ যেন খাদ্যে ভেজাল, জমি দখল, শ্রমিক শোষণ, বাজার কারসাজি, মজুতদারি, দূষণ বা অন্য কোনো উপায়ে মানুষের খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে।

পূরণ করার অর্থ রাষ্ট্র এমন পরিবেশ ও সেবা তৈরি করবে, যাতে মানুষ কাজ, ন্যায্য মজুরি, কৃষি সহায়তা, সামাজিক সুরক্ষা ও বাজারের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে। দুর্যোগ, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, আটকাবস্থা বা চরম দারিদ্র্যের কারণে কেউ খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম হলে সরাসরি খাদ্য, নগদ সহায়তা বা প্রয়োজনীয় সেবা দিতে হবে।

সম্পদ সীমিত হলেও রাষ্ট্রকে বৈষম্যহীনতা, ন্যূনতম খাদ্য এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪৭. বৈষম্যহীনতা কেন তাৎক্ষণিক বাধ্যবাধকতা? বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক দায়িত্ব কী?

বৈষম্যহীনতা তাৎক্ষণিক বাধ্যবাধকতা, কারণ মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক অবস্থান, প্রতিবন্ধিতা, জন্ম বা অন্য কোনো পরিচয়ের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। খাদ্যের অধিকারসহ সব মানবাধিকার সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, তাই বৈষম্য দূর করা ভবিষ্যতের লক্ষ্য নয়, তাৎক্ষণিক দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে কিছু অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হতে পারে, কারণ সম্পদ ও সক্ষমতার প্রশ্ন থাকে। কিন্তু বৈষম্য না করার জন্য অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন সব সময় হয় না।

এটি মূলত আইন, নীতি, প্রশাসন ও আচরণে সমতা নিশ্চিত করার প্রশ্ন। যদি খাদ্য সহায়তা, সামাজিক সুরক্ষা, জমি, কর্মসংস্থান বা পুষ্টি কর্মসূচিতে কোনো গোষ্ঠীকে বাদ দেওয়া হয়, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে অধিকার লঙ্ঘন সৃষ্টি করে। তাই, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা

নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অবিলম্বে পালনযোগ্য একটি বাধ্যবাধকতা।

৪৮. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব কী?

স্থানীয় সরকার খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, কারণ তারা মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রশাসনিক স্তর এবং স্থানীয় বাস্তবতা ভালো জানে। তারা দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও খাদ্য অনিরাপদ পরিবার শনাক্ত করে দ্রুত সহায়তা দিতে পারে। তারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ভিজিএফ, ভিজিডি, মাতৃ সহায়তা, স্কুলখাদ্য বা জরুরি খাদ্য সহায়তার তালিকা স্বচ্ছভাবে প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারে। দুর্যোগের সময় দ্রুত ত্রাণ বিতরণ এবং আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য ব্যবস্থাও তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্থানীয় বাজার তদারকি, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, ভেজালবিরোধী নজরদারি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা এবং পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রমও স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শক্তিশালী করা যায়।

৪৯. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ধনী রাষ্ট্র ও জলবায়ু পরিবর্তনে বেশি দায়ী দেশগুলোর দায়িত্ব কী?

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন, কারণ জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, খাদ্যমূল্য, ঋণ, বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলের সংকট কোনো এক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক দেশের যুদ্ধ বা অন্য সংকট অন্য দেশের জনগণের খাদ্য অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে।

ধনী ও সক্ষম রাষ্ট্রগুলোকে উন্নয়ন সহায়তা, মানবিক তহবিল, প্রযুক্তি, জলবায়ু অর্থায়ন, ন্যায্য বাণিজ্য এবং ঋণনীতির মাধ্যমে কম সম্পদশালী দেশকে সহায়তা করতে হবে। তাদের নিজস্ব বাণিজ্য, নিষেধাজ্ঞা, ভর্তুকি বা বিনিয়োগ নীতি অন্য দেশের খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি না, তাও বিবেচনা করতে হবে। অতীতের উপনিবেশ বা অন্যান্য কারণে সৃষ্ট দরিদ্র দেশের প্রতি ধনী দেশের ঐতিহাসিক দায়ও এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

ঐতিহাসিকভাবে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলোর জলবায়ু অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা এবং আগাম কার্যক্রমে অর্থ ও প্রযুক্তি দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সহায়তা কোনোভাবেই জাতীয় সরকারের দায়িত্বের বিকল্প নয়।

৫০. খাদ্য খাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কী?

খাদ্য ও পুষ্টি খাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হলো তাদের কার্যক্রমের কারণে মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য, ভূমি, পানি, শ্রম ও পরিবেশের অধিকার যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাদের নিরাপদ ও

মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ, কৃষককে ন্যায্যমূল্য প্রদান, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ভোক্তার কাছে সঠিক তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

বড় কৃষিব্যবসা বা খাদ্য কোম্পানি ভূমি দখল, পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, ক্ষতিকর রাসায়নিক, অন্যায্য চুক্তিভিত্তিক কৃষি, বীজের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, মজুতদারি বা মূল্য কারসাজির মাধ্যমে খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে গেলে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন এবং ভোক্তাকে বেশি দামে খাদ্য কিনতে হয়।

রাষ্ট্রকে প্রতিযোগিতা আইন, নিরাপদ খাদ্য আইন, ভোক্তা সুরক্ষা এবং নিয়মিত বাজার তদারকির মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। উৎপাদন, আমদানি, মজুত, সরবরাহ এবং পাইকারি ও খুচরা মূল্যসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। অধিকার লঙ্ঘিত হলে অভিযোগ, তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সরকার কোনো খাদ্যসেবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করলেও মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই থাকবে।

৫১. খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বাস্তবায়নে কমিউনিটি, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকা কী?

খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বাস্তবায়নে কমিউনিটি, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক আন্দোলনের পরস্পরসম্পূরক ভূমিকা রয়েছে। জনগণকে সচেতন করা, বঞ্চনা শনাক্ত করা, তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করা, সমাধানের দাবি উত্থাপন এবং রাষ্ট্র ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

কমিউনিটি স্থানীয় খাদ্যসংকট, অপুষ্টি, বঞ্চনা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। স্থানীয় মানুষ যৌথভাবে পারিবারিক বাগান, কমিউনিটি খাদ্যভান্ডার, পুষ্টি সচেতনতা, নিরাপদ পানি এবং দুর্যোগকালীন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। উপকারভোগীর তালিকা যাচাই, ত্রাণ বিতরণ পর্যবেক্ষণ, বাজারের অনিয়ম শনাক্ত এবং স্থানীয় সরকারের কাছে দাবি উত্থাপনের মাধ্যমেও কমিউনিটি জবাবদিহিতা বাড়াতে পারে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারে। তারা পুষ্টি সচেতনতা, কৃষি সহায়তা, জীবিকা উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক

সুরক্ষায় সংযোগ এবং কমিউনিটি সংগঠন শক্তিশালী করতে পারে। নীতি গবেষণা, সামাজিক নিরীক্ষা, বাজেট পর্যবেক্ষণ, মানবাধিকার শিক্ষা ও জনঅভিযানের মাধ্যমেও তারা রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা বাড়াতে পারে।

গণমাধ্যম ক্ষুধা, অপুষ্টি, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, ভেজাল খাদ্য, ত্রাণের অনিয়ম ও নীতিগত ব্যর্থতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, তথ্যভিত্তিক সংবাদ ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা প্রকাশের মাধ্যমে গণমাধ্যম সরকার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের জবাবদিহিতা বাড়াতে পারে। গণমাধ্যম পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য, কৃষি তথ্য, দুর্যোগ সতর্কতা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কেও জনগণকে জানাতে পারে।

শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্ষুধা, অপুষ্টি, খাদ্যমূল্য, কৃষি উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক বৈষম্য নিয়ে প্রমাণভিত্তিক গবেষণা করতে পারে। তারা টেকসই উৎপাদন পদ্ধতি, পুষ্টি উদ্যোগ, খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার, পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে পারে।

সামাজিক আন্দোলন খাদ্যবঞ্চনা, বৈষম্য, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, কৃষকের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, শ্রমিকের কম মজুরি এবং ত্রাণের অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত ও সংগঠিত দাবি গড়ে তুলতে পারে। গবেষণা, গণশুনানি, নীতি সংলাপ, জনঅভিযান, প্রশাসনিক অভিযোগ ও আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন খাদ্যকে দানভিত্তিক সহায়তা থেকে একটি কার্যকর অধিকারে রূপ দিতে পারে। ব্রাজিল, ভারত ও নেপালে নাগরিক সমাজ, কৃষক সংগঠন ও অধিকার আন্দোলন খাদ্যের অধিকার বিষয়ক আইন, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়, আইন প্রণয়নের পাশাপাশি বাজেট, সেবা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেও সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন।

৫২. আদালত কীভাবে খাদ্যের অধিকার সুরক্ষা করতে পারে?

খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ আইনগত প্রতিকার, ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। যখন মানুষ বৈষম্য, বঞ্চনা, ত্রাণ অনিয়ম, উচ্ছেদ, জীবিকা ধ্বংস বা নীতিগত ব্যর্থতার কারণে খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়, তখন আদালত

সুরক্ষা দিতে পারে। বিচার বিভাগ সংবিধান, আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির আলোকে খাদ্যের অধিকারকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিতে পারে । যেমন বিচার বিভাগ সামাজিক সুরক্ষা, পুনর্বাসন, ন্যায্য বণ্টন বা জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করার আদেশ দিতে বা প্রয়োজনীয় নতুন নীতিমালা বা আইন তৈরিরও পরামর্শ দিতে পারে। এছাড়া আদালত ভেজাল খাদ্য, বাজার কারসাজি, ভূমি দখল, পরিবেশ দূষণ বা শ্রমিক শোষণের মতো বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার রক্ষা করতে পারে।

৫৩. উন্নয়ন ও জ্বালানি প্রকল্পে কৃষিজমির ব্যবহার খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

ভূমি একটি সীমিত সম্পদ। একই জমি যখন খাদ্য উৎপাদন, জৈবজ্বালানি, শিল্পায়ন, নগরায়ণ বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন ভূমি ব্যবহারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। উর্বর কৃষিজমি কৃষি ছাড়া অন্যকাজে ব্যবহৃত হলে খাদ্য উৎপাদন কমতে পারে, খাদ্যের দাম বাড়তে পারে এবং মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যে প্রবেশাধিকার দুর্বল হতে পারে।

জৈবজ্বালানির জন্য ভুট্টা, আখ বা তেলবীজের চাষ সম্প্রসারণ, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, নগরায়ণ বা বৃহৎ সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রে কৃষিজমি, জলাশয়, চারণভূমি এবং স্থানীয় জনগণের ব্যবহৃত সাধারণ সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে কৃষক, জেলে, পশুপালক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং ভূমিনির্ভর মানুষের জীবিকা ও খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ সংকুচিত হতে পারে। জমির আনুষ্ঠানিক মালিকানা না থাকলেও বহু মানুষ এসব সম্পদের ওপর নির্ভর করে খাদ্য ও জীবিকা নিশ্চিত করে থাকে।

তাই, শিল্পায়ন, জ্বালানি বা যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় খাদ্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষিজমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা, পরিবেশগত ও মানবাধিকারভিত্তিক প্রভাব মূল্যায়ন, স্থানীয় জনগণের অর্থবহ অংশগ্রহণ, পূর্বসম্মতি, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়ন এমন হতে হবে, যাতে জ্বালানি ও শিল্পের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মানুষের খাদ্য উৎপাদন, জীবিকা এবং খাদ্যের অধিকারও সুরক্ষিত থাকে।

অধ্যায়- ৪

কীভাবে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন করা যায়?

৫৪. খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোথায় অভিযোগ করা যায়?

খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘিত হলে মানুষ প্রথমে স্থানীয় সরকার, জনপ্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি বা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তালিকা, বরাদ্দ, মজুত ও সিদ্ধান্তের তথ্যও চাইতে পারে।

ভোক্তা অধিকার, নিরাপদ খাদ্য, শ্রম, ভূমি বা সামাজিক সুরক্ষাসংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের অধীনেও প্রতিকার চাওয়া যায়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি জবাবদিহিতার আওতায় আনা যেতে পারে।

বাংলাদেশে খাদ্যের অধিকার সরাসরি বিচারযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। তবু জীবন, সমতা, আইনের সুরক্ষা ও প্রশাসনিক ন্যায্যতার প্রশ্নে উচ্চ আদালতে রিট বা জনস্বার্থ মামলা করা যেতে পারে। আদালতের প্রতিকার মামলার তথ্য, বিদ্যমান আইন ও সাংবিধানিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করবে।

কার্যকর খাদ্যের অধিকার আইনে সহজ অভিযোগ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি, আপিল, ক্ষতিপূরণ এবং আদালতে অধিকার দাবি করার স্পষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত। পাশাপাশি, গণমাধ্যমে খাদ্যের অধিকার লংঘনের বিষয়টি তুলে ধরে তার প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে।

৫৫. খাদ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া কেন প্রয়োজন?

খাদ্যের অধিকারকে সংবিধান ও আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হলে এটি কেবল নীতিগত প্রতিশ্রুতি হিসেবে থাকে না, বরং রাষ্ট্রের স্পষ্ট দায়িত্বে পরিণত হয়। তখন কারা অধিকারভোগী, কোন প্রতিষ্ঠান কী দায়িত্ব পালন করবে, ন্যূনতম কী ধরনের সেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, কীভাবে বাজেট বরাদ্দ হবে এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোথায় প্রতিকার চাওয়া যাবে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

আইনগত স্বীকৃতি ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার জন্য একটি স্থায়ী

কাঠামো তৈরি করে। এর ফলে খাদ্য, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পানি, বাজার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কর্মসূচিগুলোকে একটি অভিন্ন অধিকারভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে আনা যায়। এতে সরকার পরিবর্তন হলেও গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ও কর্মসূচি ইচ্ছামতো বন্ধ করার ঝুঁকি কমে এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও বাজেটের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের স্বীকৃতি বৈষম্য ও বাদ পড়ার বিরুদ্ধেও সুরক্ষা দেয়। দরিদ্র, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র কৃষক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ খাদ্য বা পুষ্টিসেবা থেকে বঞ্চিত হলে তারা অভিযোগ, প্রশাসনিক প্রতিকার বা বিচারিক প্রতিকারের সুযোগ পেতে পারে। একই সঙ্গে আদালত, সংসদ, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের পদক্ষেপ মূল্যায়নের একটি স্পষ্ট মানদণ্ড পায়।

তবে শুধু সংবিধান বা আইনে অধিকার লিখে দিলেই ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর হয় না। এর সঙ্গে কার্যকর প্রতিষ্ঠান, পর্যাপ্ত বাজেট, নির্ভরযোগ্য তথ্য, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, জনঅংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ আইনগত স্বীকৃতি হলো ভিত্তি, আর কার্যকর বাস্তবায়নই সেই অধিকারকে মানুষের জীবনে বাস্তবে পৌঁছে দেয়।

৫৬. খাদ্যের অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশে কী আইনগত বিধান রয়েছে?

বাংলাদেশের সংবিধানে খাদ্যের অধিকারকে স্বতন্ত্র ও সরাসরি বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে সংবিধানের একাধিক বিধান সম্মিলিতভাবে এই অধিকারের শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি তৈরি করেছে।

সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলা হয়েছে। তবে এসব বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের ৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, এগুলো রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের নির্দেশক এবং সংবিধান ও অন্যান্য আইন ব্যাখ্যার ভিত্তি হলেও সরাসরি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের রাষ্ট্রপক্ষ। সনদের ১১ অনুচ্ছেদে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং ক্ষুধা থেকে মুক্ত থাকার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সনদের বিধান দেশীয় আইনে

অন্তর্ভুক্ত না হলে সাধারণভাবে তা সরাসরি বলবৎযোগ্য হয় না। তবে সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে এসব আন্তর্জাতিক মান আইন ব্যাখ্যায় সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশে খাদ্যের অধিকারের সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু অধিকারটি এখনো বিভিন্ন সাংবিধানিক ও খাতভিত্তিক বিধানের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে সুরক্ষিত।

৫৭. একটি কার্যকর জাতীয় খাদ্যের অধিকার আইন কেমন হওয়া উচিত এবং এতে কী কী উপাদান থাকা প্রয়োজন?

খাদ্যের অধিকার আইনের লক্ষ্য শুধু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা নয়। মানুষ যেন নিয়মিত, বৈষম্যহীন, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে খাদ্যে প্রবেশাধিকার পায়, তা নিশ্চিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। একটি কার্যকর জাতীয় খাদ্যের অধিকার আইনে প্রত্যেক মানুষের পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর, সাশ্রয়ী এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্য পাওয়ার অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হতে হবে।

আইনে রাষ্ট্রের খাদ্যের অধিকারকে সম্মান করা, সুরক্ষা দেওয়া এবং পূরণ করার বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। খাদ্য উৎপাদন, মজুত, সরবরাহ, মূল্য স্থিতিশীলতা, বাজার তদারকি, নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা এবং জলবায়ু-সহনশীল খাদ্যব্যবস্থার বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

আইনে সামাজিক সুরক্ষা, মাতৃ ও শিশুপুষ্টি, বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি, ন্যায্যমূল্যে খাদ্য বিতরণ, জরুরি খাদ্য ও নগদ সহায়তা এবং স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনে সহায়তার সুস্পষ্ট বিধান থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে খাদ্যে ভেজাল, মজুতদারি, বাজার কারসাজি, অন্যায্য মূল্যবৃদ্ধি, একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যায্য বাণিজ্যিক আচরণ প্রতিরোধে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আইন বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, নির্দিষ্ট বাজেট, সময়সীমা, সমন্বয়ব্যবস্থা এবং পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘিত হলে মানুষ যেন সহজে অভিযোগ করতে, তদন্ত চাইতে, প্রতিকার পেতে এবং প্রয়োজন হলে আদালতে অধিকার দাবি করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও থাকতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত পরিবীক্ষণ, স্বাধীন তদারকি, তথ্য প্রকাশ এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া আইনে তথ্য প্রকাশ, জনঅংশগ্রহণ, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত মূল্যায়ন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৫৮. বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের বিদ্যমান প্রধান নীতি ও পরিকল্পনাগুলো কী?

বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন সময় সমন্বিত নীতি, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ কাঠামো গ্রহণ করেছে। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের পর এই উদ্যোগ আরও জোরদার হয়। এর ধারাবাহিকতায় জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬ (National Food Policy 2006) প্রণয়ন করা হয় এবং এর বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা (National Food Policy Plan of Action) গ্রহণ করা হয়। খাদ্য, কৃষি ও পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (Country Investment Plan, CIP) প্রণয়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে হালনাগাদ করা হয়েছে।

বর্তমান নীতিগত কাঠামোর মধ্যে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ এবং এর কর্মপরিকল্পনা ২০২১ থেকে ২০৩০, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ থেকে ২০৪১, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং সামাজিক সুরক্ষা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ।

৫৯. খাদ্যের অধিকার ও অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণের সম্পর্ক কী?

খাদ্যের অধিকার ও অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ খাদ্য, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, বাজার নিয়ন্ত্রণ বা ত্রাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতি ও সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। এসব সিদ্ধান্ত যদি জনগণের মতামত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করে নেওয়া হয়, তাহলে অনেক সময় প্রকৃত চাহিদা ও সমস্যাগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়।

অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে কৃষক, জেলে, নারী, শ্রমিক, আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরা নিশ্চিত করা যায়। এর ফলে নীতি ও কর্মসূচি আরও বাস্তবসম্মত, ন্যায্য ও কার্যকর হয়। একইসাথে জনগণের অংশগ্রহণ জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে এবং খাদ্য সহায়তা, বাজেট বা ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতি ও বঞ্চনা কমাতে সহায়তা করে।

৬০. কৌশলগত মামলা কী এবং কেন করা হয়? অধিকার প্রসঙ্গে এটি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

কৌশলগত বিচারিক পদক্ষেপ হলো এমন আইনি উদ্যোগ, যেখানে শুধু একটি ব্যক্তিগত বিরোধ মেটানো নয়, বরং বৃহত্তর জনস্বার্থ, নীতি পরিবর্তন বা অধিকার সুরক্ষার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া হয়। এর লক্ষ্য হলো আদালতের রায়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তন আনা। খাদ্যের অধিকার প্রসঙ্গে এটি ব্যবহার হতে পারে যখন ক্ষুধা, ত্রাণ বঞ্চনা, সামাজিক সুরক্ষা থেকে বাদ পড়া, ভেজাল খাদ্য, অন্যায় উচ্ছেদ, ভূমি বঞ্চনা বা শিশু পুষ্টি

ব্যর্থতার মতো সমস্যা বহু মানুষকে প্রভাবিত করে। তখন আদালতে মামলা করে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা যায়। এ ধরনের পদক্ষেপে আদালত নীতি সংশোধন, তালিকা পুনর্বিবেচনা, জরুরি সহায়তা, নিরাপদ খাদ্য তদারকি, বাজেট অগ্রাধিকার বা বৈষম্য দূরীকরণের নির্দেশ দিতে পারে।

৬১. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় ও জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করা উচিত?

কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাণিজ্য, শ্রম, পানি, পরিবেশ, দুর্যোগ ও সামাজিক সুরক্ষা- সকল কিছুর সঙ্গেই খাদ্যের অধিকার যুক্ত। তাই কোনো মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান এককভাবে এটি বাস্তবায়ন করতে পারে না।

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন জাতীয় পর্যায়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সমন্বয় কাঠামো থাকতে হবে, যা বাস্তবায়নের লক্ষ্য, দায়িত্ব, বাজেট ও সূচক নির্ধারণ করবে। স্থানীয় সরকারকে বাস্তবায়ন, তালিকা যাচাই, বাজার ও পুষ্টি পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ গ্রহণের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় সম্পদ দিতে হবে। কোন মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান কোন কাজের জন্য দায়ী থাকবে, তা লিখিতভাবে স্পষ্ট করতে হবে। নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে অগ্রগতি, ঘাটতি ও করণীয় পর্যালোচনা করতে হবে।
খাদ্যের অধিকার কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাণিজ্য, শ্রম, পানি, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই কোনো একটি মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান এককভাবে এই অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট সমন্বয় প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকারকে শুধু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিলে যথেষ্ট হবে না। ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ শনাক্তকরণ, উপকারভোগীর তালিকা যাচাই, খাদ্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, পুষ্টিসেবা, সামাজিক সুরক্ষা, অভিযোগ গ্রহণ এবং জরুরি সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, জনবল, তথ্য ও বাজেট দিতে হবে।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের জন্য একটি সমন্বিত তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে খাদ্য উৎপাদন, বাজারদর, মজুত, অপুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি বা অন্যদেশের কৃষি ও রপ্তানী নীতি কিভাবে বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন তথা খাদ্য অধিকারকে প্রভাবিত করে, তা নিয়মিত

পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে হবে এবং এই তথ্য ব্যবস্থায় তা যুক্ত করতে হবে। সরকারকে সংসদ ও জনগণের কাছে নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। একই সঙ্গে স্বাধীন মূল্যায়ন, নিরীক্ষা, সামাজিক নিরীক্ষা এবং অভিযোগ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দায়িত্ব, তথ্য ও জবাবদিহিতা স্পষ্ট না থাকলে একই কাজের পুনরাবৃত্তি হয়, গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী বাদ পড়ে এবং ব্যর্থতার জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না। তাই কার্যকর সমন্বয়, স্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন, পর্যাপ্ত সম্পদ, জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বাধীন তদারকির মাধ্যমেই জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৬২. জলবায়ু অর্থায়ন, ক্ষয়ক্ষতি তহবিল ও আন্তর্জাতিক সহায়তা কীভাবে অধিকারভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যবহার যেতে পারে?

জলবায়ু অর্থায়ন, ক্ষয়ক্ষতি তহবিল ও আন্তর্জাতিক সহায়তাকে শুধু দুর্যোগের পর খাদ্য বা ত্রাণ বিতরণের জন্য নয়, মানুষের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য, পুষ্টি ও জীবিকার অধিকার সুরক্ষায় ব্যবহার করা উচিত। এই অর্থায়নের লক্ষ্য হবে এমন একটি খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা জলবায়ু সহনশীল, পরিবেশবান্ধব, ন্যায়সংগত, স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

জলবায়ু অর্থায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী কৃষক, জেলে, পশুপালক এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে সরাসরি পৌঁছাতে হবে। এই অর্থ দিয়ে লবণাক্ততা, খরা, বন্যা ও অতিরিক্ত তাপসহনশীল স্থানীয় ফসলের জাত, পরিবেশবান্ধব কৃষি, পানি ব্যবস্থাপনা, বীজ সংরক্ষণ, কৃষি গবেষণা এবং স্থানীয় খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারব্যবস্থা শক্তিশালী করা যেতে পারে। এতে দুর্যোগের মধ্যেও খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব হবে।

ক্ষয়ক্ষতি তহবিলকে শুধু জরুরি ত্রাণে সীমাবদ্ধ না রেখে ফসল, জমি, গবাদিপশু, মৎস্যসম্পদ ও জীবিকা হারানো মানুষের ক্ষতিপূরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনে ব্যবহার করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনরায় উৎপাদনে ফিরিয়ে আনতে অনুদান, সহজ শর্তের অর্থায়ন, উপযোগী কৃষিবীমা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে হবে। নদীভাঙন, লবণাক্ততা বা দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, কাজ, খাদ্য ও সামাজিক সুরক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করাও এই তহবিলের অংশ হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক সহায়তা এমনভাবে দিতে হবে, যাতে কোনো দেশের

খাদ্য সার্বভৌমত্ব, স্থানীয় বীজ, ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও নিজস্ব উৎপাদনব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল না হয়। সহায়তার নামে নির্দিষ্ট কোম্পানির বীজ, রাসায়নিক বা প্রযুক্তির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরতা তৈরি করা উচিত নয়। বরং প্রযুক্তি হস্তান্তর, আবহাওয়ার আগাম সতর্কতা, কৃষি গবেষণা, স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সব ধরনের অর্থায়নে স্বচ্ছতা, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, বৈষম্যহীনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কোন খাতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, কারা সুবিধা পাচ্ছে এবং তা মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার কতটা শক্তিশালী করছে, তা নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রকাশ করতে হবে। তাহলেই জলবায়ু অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক সহায়তা সাময়িক ত্রাণের পরিবর্তে একটি টেকসই ও অধিকারভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার হবে।

৬৩. খাদ্যের অধিকারে উৎপাদনকারী ও কৃষকের কী স্বার্থ রয়েছে?

খাদ্যের অধিকার বলতে প্রাথমিকভাবে ভোক্তা বা আহারকারীর অধিকারের কথাই চলে আসে। কিন্তু খাদ্যের অধিকার একটি বিস্তৃত ধারণা; শুধু ভোক্তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণার মধ্যে খাদ্য উৎপাদনকারী বা কৃষকের অধিকারও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে কৃষকদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী, সেখানে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে সার-বীজ-সেচ-কৃষিযন্ত্র তথা কৃষি উপকরণ সুলভ ও সহজলভ্য করা, কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য কৃষি বীমা, গুদামজাত সুবিধা, কৃষিপণ্য পরিবহন ও বিপণন সুবিধা, ভূমিহীন, বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুরের হিস্যা, রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা/ কৃষি ভর্তুকিতে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণ, নারী কৃষকের এসব সেবা ও সুযোগে অন্তর্ভুক্তি – এ বিষয়গুলোও খাদ্যের অধিকারের অন্যতম বিবেচিত বিষয়। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেলে, জমি, পানি, বীজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণে প্রবেশাধিকার না পেলে তারা খাদ্য উৎপাদনে আগ্রহ এবং সক্ষমতা হারাবেন। যা খাদ্য উৎপাদনে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, বাজারে খাদ্যের সরবরাহ সংকুচিত হতে পারে এবং খাদ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে, যা অন্যান্য মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ও সাশ্রয়ী খাদ্য প্রাপ্তিকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

৬৪. খাদ্য মূল্যস্ফীতি খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র কী করতে পারে?

খাদ্য মূল্যস্ফীতি হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাদ্যপণ্যের গড় মূল্য বৃদ্ধির হার। খাদ্যের দাম মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় দ্রুত বাড়লে নিম্ন ও স্থির আয়ের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, নিজেদের আয়ের সাথে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের সমন্বয় করতে তারা প্রথমে ডিম, মাছ, দুধ, ফল ও সবজির মতো পুষ্টিকর খাবার কমায়, পরে খাবারের পরিমাণও কমাতে বাধ্য হতে পারে। এর ফলে পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যে প্রবেশাধিকার সীমিত হয়, অপুষ্টির ঝুঁকি বাড়ে এবং খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান না, অথচ একই পণ্য ভোক্তাকে অনেক বেশি দামে কিনতে হয়। এ

ধরনের বৈষম্য বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতা, অতিরিক্ত মধ্যস্বত্বভোগী, মজুতদারি, কারসাজি বা সরবরাহ শৃঙ্খলের অদক্ষতার ফল। এতে একদিকে কৃষক উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হন, অন্যদিকে ভোক্তার খাদ্যে প্রবেশাধিকার কমে যায়।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও সরবরাহের অবস্থা, সরকারি মজুত, আমদানি, পরিবহন ব্যয়, বাজার প্রতিযোগিতা, মজুতদারি ও কারসাজি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্ক সমন্বয়, ভর্তুকি, সরকারি বিক্রয় কর্মসূচি, নগদ সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা যেতে পারে। একই সঙ্গে কৃষকের ন্যায্য মূল্য এবং ভোক্তার জন্য সহনীয় মূল্য নিশ্চিত করতে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা, সরবরাহ শৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থাপনা আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষার অর্থমূল্যও নিয়মিত মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করা প্রয়োজন, যাতে সহায়তার প্রকৃত মূল্য কমে না যায়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য শুধু দাম কমানো নয়, বরং উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের অধিকার সুরক্ষা এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৬৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কীভাবে মানুষের খাদ্যের অধিকার পূরণে সহায়তা করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও খাদ্য অধিকারের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মানুষের খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্র দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে খাদ্য, নগদ সহায়তা, ভাতা, কর্মসংস্থান বা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য কেনার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, ভিজিডি, ওএমএস, টিসিবির ভর্তুকিমূল্যে পণ্য বিক্রি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতার মতো কর্মসূচি মানুষের আয় ও খাদ্য কেনার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কাজ হারানো, অসুস্থতা, মূল্যস্ফীতি বা দুর্যোগের সময় এসব সহায়তা পরিবারকে খাদ্যসংকট মোকাবিলা ও অপুষ্টি প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।

তবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও খাদ্যের অধিকার এক বিষয় নয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সাধারণত নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে পরিচালিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সুবিধা সীমিত এবং তা সবার জন্য আইনগতভাবে দাবি করার মতো সর্বজনীন অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সরকার প্রয়োজন, নীতি বা বাজেটের ভিত্তিতে সরকার কোনো কর্মসূচির ধরন, সুবিধার পরিমাণ বা মেয়াদ পরিবর্তন করতে পারে।

অন্যদিকে খাদ্যের অধিকার একটি সর্বজনীন মানবাধিকার। এটি শুধু দরিদ্র, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। প্রত্যেক মানুষের সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং গ্রহণযোগ্য খাদ্যে মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশাধিকার থাকা এই অধিকারের মূল কথা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মানুষের খাদ্য অর্জনের সুযোগ নষ্ট না করা, অন্যের মাধ্যমে সেই অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রতিরোধ করা এবং প্রয়োজন হলে সক্রিয় সহায়তা দেওয়া।

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো মানুষের খাদ্যের অধিকার পূরণে সহায়তা করলেও উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়ম, প্রকৃত দরিদ্র মানুষের বাদ পড়া, অযোগ্য ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি, অপর্যাপ্ত সহায়তা, জটিল প্রক্রিয়া, দুর্বল তদারকি এবং সীমিত বাজেট এই কর্মসূচিগুলোর কার্যকারি হ্রাস করে। অনেক কর্মসূচি তাৎক্ষণিক খাদ্যসংকট কমালেও দীর্ঘমেয়াদে আয়, কর্মসংস্থান, উৎপাদনক্ষমতা ও স্বনির্ভরতা বাড়াতে তার ভূমিকা সীমিত।

তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে দান বা অনুগ্রহ হিসেবে নয়, অধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালনা করতে হবে। সুবিধার পরিমাণ মূল্যস্ফীতি ও পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ, সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন, সহজ আবেদনপ্রক্রিয়া, নিয়মিত তদারকি এবং অভিযোগ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থান, কৃষি সহায়তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে এসব কর্মসূচিকে যুক্ত করা গেলে তা মানুষের খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে আরও কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারবে।

৬৬. কৃষি সংস্কার কীভাবে খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করে?

কৃষি সংস্কার হলো জাতীয় সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি খাতে চলমান নানা ধরনের অব্যবস্থাপনা , চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহ সমাধান ও ইতিবাচক পরিবর্তন করার মাধ্যমে কৃষি তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের আয় বৃদ্ধি , উৎপাদন ও সম্পদে সকলের প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও চর্চার সংস্কার । খাদ্য উৎপাদন, কৃষকের আয় এবং উৎপাদন সম্পদে ন্যায্য প্রবেশাধিকার উন্নীতকরণের মাধ্যমে কৃষি সংস্কার খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যখন জমি, পানি, বীজ, ঋণ, প্রযুক্তি ও বাজার সুবিধা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে, তখন বেশি মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয় ও খাদ্য সংগ্রহের সক্ষমতা বাড়ে। ক্ষুদ্র কৃষক, নারী কৃষক ও ভূমিহীন মানুষের জন্য ভূমি সংস্কার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে নিরাপদ অধিকার থাকলে তারা

বিনিয়োগ করতে পারেন, উৎপাদন বাড়াতে পারেন এবং পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী হয়। ন্যায্য মূল্যনীতি, কৃষি সহায়তা, সেচ ব্যবস্থা, সংরক্ষণ সুবিধা এবং বাজারে মধ্যস্বত্বভোগী নিয়ন্ত্রণ কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে তারা নিজেরাও পুষ্টিকর খাদ্য কিনতে সক্ষম হয়। জলবায়ু সহনশীল কৃষি, বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের অগ্রাধিকার দিলে কৃষি ব্যবস্থা আরও টেকসই হয়। অতএব, কৃষি সংস্কার শুধুমাত্র উৎপাদনই বৃদ্ধি করে না, একইসাথে এটি ন্যায়ভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৬৭. কৃষি ও খাদ্য ভর্তুকি িএবংসরকারিখাদ্যক্রয় কীভাবে ন্যায়সঙ্গত ও অধিকারভিত্তিক করা যায়?

কৃষি ও খাদ্য ভর্তুকির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সুরক্ষা দেওয়া এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা। তাই ভর্তুকি ও সরকারি সহায়তা এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, পশুপালক, নারী কৃষক, বর্গাচাষি এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদক।

সার, বীজ, সেচ, কৃষিযন্ত্র, জ্বালানি, ঋণ ও কৃষি বীমার মতো সহায়তা প্রকৃত উৎপাদকের কাছে স্বচ্ছ ও বৈষম্যহীনভাবে পৌঁছাতে হবে। একই সঙ্গে ভর্তুকির সুবিধা কারা পাচ্ছে, এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব কী এবং এটি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কতটা অবদান রাখছে, সে বিষয়ে নিয়মিত মূল্যায়ন ও তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তুকি যদি বড় প্রতিষ্ঠান বা মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে বৈষম্য বাড়ে এবং খাদ্যের অধিকার দুর্বল হয়।

সরকারি খাদ্য ক্রয় ব্যবস্থাও স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকবান্ধব হতে হবে। ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ, সহজ নিবন্ধন, সময়মতো অর্থপ্রদান এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক খাবার, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং সরকারি খাদ্য বিতরণে স্থানীয় কৃষকের উৎপাদিত খাদ্য অগ্রাধিকার পেলে একদিকে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে জনগণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতাও শক্তিশালী হয়।

৬৮. খাদ্যের অধিকার সুরক্ষায় সরকারি খাদ্য মজুত নীতি কেন

সরকারি খাদ্য মজুত নীতি খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। দুর্যোগ, ফসলহানি, মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধ, বৈশ্বিক সরবরাহ সংকট বা আমদানি ব্যাহত হলে এটি খাদ্যের প্রাপ্যতা ও

গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি কীভাবে খাদ্যের অধিকার রক্ষা করে?

বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, মানবিক সহায়তা এবং জরুরি খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের কাছে দ্রুত খাদ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

একটি কার্যকর খাদ্য মজুত নীতিতে কোন খাদ্য কত পরিমাণে মজুত থাকবে, কখন ও কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হবে এবং কীভাবে খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখা হবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ থাকতে হবে। শুধু চাল বা ক্যলরির ওপর নির্ভর না করে পুষ্টির চাহিদা বিবেচনায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত সংরক্ষণ ও গুদামব্যবস্থা গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য মজুত ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে। মজুতের পরিমাণ, সরকারি ক্রয়, বিতরণ, ক্ষয়ক্ষতি এবং গুদাম ব্যবস্থাপনার তথ্য নিয়মিত প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা করতে হবে, যাতে অস্বচ্ছতা, অপচয় বা বাজারে অযৌক্তিক প্রভাব সৃষ্টি না হয়। এভাবে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ সরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থা সংকটের সময় খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে এবং মানুষের খাদ্যের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬৯. বীজের অধিকার, কৃষিজীববৈচিত্র্য ও কৃষকের নিজস্ব বীজ সংরক্ষণ খাদ্যের অধিকারের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত?

বীজ খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তি। তাই বীজের ওপর কৃষকের অধিকার, কৃষিজীববৈচিত্র্য এবং নিজস্ব বীজ সংরক্ষণ ও বিনিময়ের স্বাধীনতা খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কৃষক যদি নিজের বীজ সংরক্ষণ, ব্যবহার, বিনিময় বা উন্নয়ন করতে না পারেন, তাহলে তিনি ক্রমেই বাণিজ্যিক বীজ ও বহিরাগত কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, যা খাদ্য উৎপাদনের খরচ, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বাড়ায়।

এক বা কয়েকটি বাণিজ্যিক জাতের ওপর অতিনির্ভরতা কৃষিজীববৈচিত্র্য কমিয়ে দেয় এবং রোগ, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন বা বাজার সংকটের সময় খাদ্যব্যবস্থাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে স্থানীয় ও দেশীয় জাতের বীজ সংরক্ষণ কৃষির সহনশীলতা বাড়ায়, পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যময় খাদ্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাই বীজ আইন, মেধাস্বত্ব এবং কৃষিনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষকের প্রচলিত অধিকার, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জ্ঞান এবং কৃষিজীববৈচিত্র্য

সুরক্ষিত রাখতে হবে। কৃষকের বীজ সংরক্ষণ, ব্যবহার, বিনিময় ও উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি গবেষণা, বীজ উন্নয়ন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র কৃষক, নারী কৃষক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এতে খাদ্যব্যবস্থা আরও বৈচিত্র্যময়, টেকসই এবং জলবায়ু-সহনশীল হবে, যা খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করবে।

৭০. ভূমি দখল ও অন্যায্য চুক্তিভিত্তিক কৃষি কীভাবে কৃষক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করে?

ভূমি, পানি, বন, নদী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক, আদিবাসী, জেলে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্য উৎপাদন ও জীবিকার প্রধান ভিত্তি। বৃহৎ প্রকল্প, শিল্পায়ন বা বাণিজ্যিক বিনিয়োগের কারণে এসব সম্পদ থেকে মানুষ উচ্ছেদ হলে বা প্রবেশাধিকার হারালে তারা শুধু জমিই হারায় না, খাদ্য উৎপাদন, আয় এবং নিজের খাদ্য নিশ্চিত করার সক্ষমতাও হারায়। ন্যায্য পরামর্শ, পূর্বসম্মতি, যথাযথ ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের ভূমি অধিগ্রহণ খাদ্যের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

চুক্তিভিত্তিক কৃষি কৃষকের জন্য বাজার, প্রযুক্তি, মানসম্মত উপকরণ ও আগাম অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে চুক্তি যদি অস্পষ্ট বা অন্যায্য হয়, তাহলে মূল্য, মান, বীজ, কৃষি উপকরণ ও ঝুঁকির শর্ত কোম্পানি একতরফাভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এর ফলে ফসল বাতিল, ঋণের বোঝা, অর্থপ্রাপ্তিতে বিলম্ব বা উৎপাদন ব্যর্থতার ঝুঁকি প্রধানত কৃষকের ওপর বর্তায়, যা তার খাদ্য ও জীবিকাকে অনিশ্চিত করে।

তাই ভূমি অধিগ্রহণ ও চুক্তিভিত্তিক কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সহজ ভাষায় চুক্তি, ন্যূনতম মূল্য ও ঝুঁকি মোকাবেলায় যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা, কার্যকর অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী, বর্গাচাষি, আদিবাসী ও প্রথাগত ভূমি ব্যবহারকারীদের অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিতে হবে।

৭১. খাদ্য অপচয় ও ফসল কাটার পর ক্ষতি কমানো খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে শক্তিশালী করে?

খাদ্য উৎপাদন করলেই খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত হয় না। উৎপাদিত ফসল যদি কাটার পর সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে নষ্ট হয়ে যায়, অথবা ভোক্তা পর্যায়ে অপচয় হয়, তাহলে সেই খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এর ফলে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন, বাজারে সরবরাহ কমে যায় এবং খাদ্যের দাম বেড়ে দরিদ্র মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার সীমিত হয়।

ফসল কাটার পর ক্ষতি কমাতে উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা, শীতল সরবরাহ শৃঙ্খল, শুকানো ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, মানসম্মত প্যাকেজিং, নিরাপদ পরিবহন এবং সময়োপযোগী বাজার তথ্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে খুচরা বাজার, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং পরিবারে খাদ্য অপচয় কমাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত নিরাপদ খাদ্য পুনর্বণ্টন এবং খাদ্য দানের উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। খাদ্য অপচয় ও ফসল কাটার পর ক্ষতি কমানো উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নয়, তবে একই পরিমাণ উৎপাদিত খাদ্য থেকে আরও বেশি মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এর ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়, খাদ্যের প্রাপ্যতা ও স্থিতিশীলতা উন্নত হয় এবং পানি, জমি, জ্বালানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়ও কমে। তাই খাদ্য অপচয় ও ফসল কাটার পর ক্ষতি কমানো খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

৭২. খাদ্য বৈচিত্র্য কেন খাদ্যের অধিকারের অংশ?

খাদ্য বৈচিত্র্য পুষ্টি অধিকারের একটি মৌলিক উপাদান এবং খাদ্যের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ মানুষ শুধু এক ধরনের খাদ্য খেয়ে সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারে না। একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যে শর্করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ, আঁশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকতে হয়। তাই খাদ্যের অধিকার শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয় নয়, বরং বৈচিত্র্যময়, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যে নিয়মিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ও।

বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বে প্রায় ২.৭ বিলিয়ন মানুষ একটি স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য রাখেনি। এটি প্রমাণ করে যে শুধু পেট ভরে খেতে পারা যথেষ্ট নয়, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্য পাওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যখন একটি পরিবার প্রধানত চাল বা অন্যান্য কম দামের একঘেয়ে খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাল, মাছ, ডিম, দুধ, ফল, শাকসবজি বা অন্যান্য প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে না, তখন তাদের ক্যালোরির চাহিদা পূরণ হলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না। ফলে শিশুদের খর্বাকৃতি, রক্তস্বল্পতা, ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতি, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস এবং প্রাপ্তবয়স্কদের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। তাই খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শুধু খাদ্যের পরিমাণ নয়, খাদ্যের বৈচিত্র্য, পুষ্টিমান এবং সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রাপ্যতাও নিশ্চিত করতে হবে।

৭৩.খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের ভূমিকা কী এবং নিরাপদ খাদ্য কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

খাদ্যের অধিকার একটি বিস্তৃত মানবাধিকার। এর অর্থ হলো প্রত্যেক মানুষের পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর, সাশ্রয়ী এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যে নিয়মিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। তাই নিরাপদ খাদ্যের অধিকার খাদ্যের অধিকারের একটি অপরিহার্য অংশ। অনিরাপদ বা ভেজালযুক্ত খাদ্য পর্যাপ্ত খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

নিরাপদ খাদ্য বলতে এমন খাদ্য বোঝায়, যা উৎপাদন থেকে ভোগ

পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ভেজাল, ক্ষতিকর রাসায়নিক, জীবাণু ও অন্যান্য দূষণ থেকে মুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাত করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হলে খাদ্যজনিত রোগ, অপুষ্টি এবং বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমে, ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর আইন ও মানদণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরীক্ষাগার ও নিয়মিত পরিদর্শন, ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার, দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা, খাদ্যের উৎস শনাক্তকরণ এবং ভোক্তার অভিযোগ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফল, প্রতিষ্ঠানের নাম এবং গৃহীত ব্যবস্থা প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধু ভোক্তার নয়। কৃষক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী, পরিবহনকারী, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ খাদ্য শৃঙ্খলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার মাধ্যমেই খাদ্যের অধিকার এবং জনস্বাস্থ্য কার্যকরভাবে সুরক্ষিত হতে পারে।

৭৪. পুষ্টিসংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কী এবং এটি কীভাবে পরিকল্পনা করা উচিত?

পুষ্টিসংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা হলো এমন একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, যা শুধু ক্ষুধা কমানো বা আয় বৃদ্ধি নয়, বরং মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং অপুষ্টি প্রতিরোধকেও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে নগদ সহায়তা, খাদ্য সহায়তা, বিদ্যালয়ভিত্তিক খাবার, মাতৃত্বকালীন সহায়তা, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ একসঙ্গে প্রদান করা হতে পারে।

এ ধরনের কর্মসূচি পরিকল্পনার সময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বয়স, লিঙ্গ, স্বাস্থ্য, পুষ্টিগত চাহিদা এবং স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস বিবেচনায় নিতে হবে। বিশেষ করে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। কর্মসূচির কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং শুধু কতজন সহায়তা পেয়েছে তা নয়, বরং খাদ্য গ্রহণের বৈচিত্র্য, অপুষ্টির হার, মাতৃ ও শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যগত পরিবর্তনের মতো ফলাফলও মূল্যায়ন করতে হবে।

৭৫. জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

জলবায়ু পরিবর্তন দীর্ঘ সময় ধরে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার স্বাভাবিক ধরনে পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে তাপপ্রবাহ, অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার মতো দুর্যোগের তীব্রতা ও অনিশ্চয়তা বাড়ে। এসব ঘটনা খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টির ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বন্যায় ফসলি জমি ডুবে যেতে পারে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লবণাক্ত পানি কৃষিজমিতে প্রবেশ করতে পারে এবং খরা বা অতিরিক্ত তাপে ফসলের ফলন কমে যেতে পারে। গবাদিপশু, মাছের ঘের, পুকুর, বীজ, কৃষি উপকরণ ও মিঠাপানির উৎসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে কৃষক, জেলে ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদকের আয় কমে যায় এবং পরবর্তী মৌসুমে উৎপাদনের সক্ষমতাও দুর্বল হয়। দুর্যোগে সড়ক, সেতু, ঘাট, বাজার, গুদাম, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে উৎপাদিত খাদ্য প্রয়োজনীয় এলাকায় পৌঁছানো কঠিন হয়, খাদ্যের অপচয় বাড়ে এবং বাজারে সরবরাহ কমে যায়।

উৎপাদন ও সরবরাহ কমে গেলে এবং পরিবহন ব্যয় বাড়লে খাদ্যের দাম অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। একই সময়ে কৃষক, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষ কাজ ও আয় হারালে তাদের খাদ্য কেনার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বাজারে খাদ্য থাকলেও অনেক পরিবার পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য কিনতে পারে না। তারা খাবারের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য কমাতে বাধ্য হয়, যা অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়।

তাই জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু খাদ্য উৎপাদন নয়, খাদ্যের প্রাপ্যতা, সরবরাহ, মূল্য, মানুষের আয় এবং খাদ্যে প্রবেশাধিকারকে প্রভাবিত করে। এর ফলে পুরো খাদ্যব্যবস্থা ও মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ে।

খাদ্যের অধিকারভিত্তিক অভিযোজন কৌশলের লক্ষ্য শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং সব মানুষের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যে

মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এ জন্য জলবায়ু সহনশীল ফসল ও স্থানীয় বীজ সম্প্রসারণ, সেচ ও পানি সংরক্ষণ, মাটির উর্বরতা রক্ষা, ফসল বৈচিত্র্য, কৃষি বীমা, আবহাওয়া পূর্বাভাস, আগাম সতর্কতা, নিরাপদ খাদ্য মজুত এবং দুর্যোগ সহনশীল বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষক, নারী কৃষক, জেলে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন মানুষ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠী ও শহুরে দরিদ্রদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন। জমি, পানি, বীজ, ঋণ, প্রযুক্তি, বাজার ও সামাজিক সুরক্ষায় তাদের ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগের সময় দ্রুত খাদ্য ও নগদ সহায়তা দিতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অংশগ্রহণে অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৭৬. সংকটকালে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার কীভাবে নির্ধারণ করা উচিত?

সংকটকালে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন, ঝুঁকির মাত্রা এবং নিজস্ব সক্ষমতায় সংকট মোকাবিলার সামর্থ্য ইত্যাদি অগ্রাধিকার নির্ধারণের ভিত্তি হওয়া উচিত। যাদের জীবন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জীবিকা সবচেয়ে বেশি হুমকির মধ্যে এবং নিজস্ব সম্পদ ও সহায়তা পাওয়ার সুযোগ সবচেয়ে কম, তাদের আগে সহায়তা দিতে হবে।

অগ্রাধিকার নির্ধারণে রাজনৈতিক প্রভাব, ব্যক্তিগত পরিচয় বা অনুমানের পরিবর্তে নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবহার করতে হবে। দারিদ্র্য, খাদ্য গ্রহণের ঘাটতি, অপুষ্টি, আয় ও জীবিকার ক্ষতি, ঋণ, বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, গর্ভাবস্থা, বাস্তুচ্যুতি, ভৌগোলিক ঝুঁকি এবং সরকারি সেবায় প্রবেশাধিকারের মতো সূচক বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। নারীপ্রধান পরিবার, শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ভূমিহীন মানুষ, দিনমজুর, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং দুর্গম এলাকার মানুষ সাধারণত বেশি ঝুঁকিতে থাকলেও কেবল গোষ্ঠীগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়, প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে। একাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সংকটের আগেই ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার চিহ্নিত করা, ঝুঁকি সূচক নির্ধারণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, অর্থায়ন এবং সহায়তার পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দ্রুত দেওয়া সম্ভব হয়। এতে দুর্যোগের আগে নগদ সহায়তা, খাদ্য, নিরাপদ পানি, বীজ, পশুখাদ্য বা সরিয়ে নেওয়ার মতো আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানুষের জীবন, খাদ্য, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষতি কমানো যায়। অগ্রাধিকার নির্ধারণের পুরো প্রক্রিয়া বৈষম্যহীন, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। স্থানীয়

সরকার, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ, স্থানীয় সংগঠন ও জনগণের অংশগ্রহণে তালিকা যাচাই, অভিযোগ গ্রহণ, ভুল সংশোধন এবং নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে প্রকৃত ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ সময়মতো প্রয়োজনীয় সহায়তা পান।

৭৭. সংকট-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা ও দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন কীভাবে দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি ও আগাম কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে?

সংকট-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা সংকট দেখা দিলে নতুন কর্মসূচি চালুর জন্য অপেক্ষা না করে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমেই দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতে পারে।

দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দিতে হলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হয়। এ জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার চিহ্নিত করা, সহায়তার ধরন, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় তহবিল আগেই নির্ধারণ করে রাখা হয়। ফলে সংকট দেখা দিলে নতুন কর্মসূচি চালুর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন বলতে আগাম তহবিল, জরুরি বাজেট, বীমা, পূর্বনির্ধারিত ঋণ বা অন্যান্য অর্থায়নের ব্যবস্থা বোঝায়, যা নির্দিষ্ট পূর্বাভাস বা ঝুঁকি সূচক অতিক্রম করলেই দ্রুত ব্যবহার করা যায়। যেমন নদীর পানির উচ্চতা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ, খরা, ফসলহানি বা খাদ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আগাম কার্যক্রম শুরু করার ট্রিগার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এর ফলে দুর্যোগ আঘাত হানার আগেই নগদ অর্থ, খাদ্য, বীজ, পশুখাদ্য, নিরাপদ পানি, মানুষ ও গবাদিপশু সরিয়ে নেওয়া এবং জীবিকা ও সম্পদ সুরক্ষার মতো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। এতে ক্ষয়ক্ষতি কমে, মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার বজায় থাকে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের সময় ও ব্যয় উভয়ই কমে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে অর্থায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, পূর্বনির্ধারিত এবং স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক হতে হবে।

৭৮. নগদ সহায়তা ও খাদ্য সহায়তার মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর?

নগদ সহায়তা ও সরাসরি খাদ্য সহায়তার মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর, তার একক উত্তর নেই। এগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে বাজার সচল আছে কি না, খাদ্যের দাম কতটা স্থিতিশীল, সরবরাহ ব্যবস্থা কাজ করছে কি না, পরিস্থিতি কতটা জরুরি এবং

সহায়তাপ্রাপ্ত মানুষের বিশেষ প্রয়োজন কী তার ওপর।

বাজার সচল থাকলে এবং খাদ্য সহজে পাওয়া গেলে নগদ সহায়তা সাধারণত বেশি কার্যকর হতে পারে। এতে মানুষ নিজের প্রয়োজন, ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খাদ্য কিনতে পারে। এটি মানুষের পছন্দ ও মর্যাদা রক্ষা করে এবং স্থানীয় বাজার ও ক্ষুদ্র ব্যবসাকেও সহায়তা করে। বিশেষ করে শহুরে দরিদ্র, কর্মহীন পরিবার ও বাজারনির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সহায়তা উপযোগী হতে পারে।

তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বা বাজারে কারসাজির সময় নগদ সহায়তার প্রকৃত মূল্য দ্রুত কমে যেতে পারে। সহায়তার পরিমাণ নিয়মিত বাজারদরের সঙ্গে সমন্বয় করা না হলে মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য কিনতে পারে না। নগদ বিতরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ডিজিটাল সেবায় প্রবেশাধিকার এবং পরিবারের ভেতরে অর্থ ব্যবহারে নারীর নিয়ন্ত্রণও বিবেচনা করতে হয়।

অন্যদিকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সংঘাত বা বিচ্ছিন্ন এলাকায় বাজার ও পরিবহনব্যবস্থা ভেঙে পড়লে সরাসরি খাদ্য সহায়তা জরুরি হয়ে ওঠে। যেখানে খাদ্য পাওয়া যায় না বা সরবরাহ অনিশ্চিত, সেখানে শুধু নগদ অর্থ দিলেও মানুষ খাদ্য কিনতে পারে না। এ অবস্থায় চাল, ডাল, তেল, পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরাসরি সরবরাহ করতে হয়।

শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য, ভাউচার বা নির্দিষ্ট খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেজ বেশি কার্যকর হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নগদ ও খাদ্য সহায়তা একসঙ্গে দেওয়াই সবচেয়ে উপযোগী। তাই বাজার সচল থাকলে নগদ সহায়তা, বাজার অচল হলে সরাসরি খাদ্য সহায়তা এবং বাজার আংশিক সচল থাকলে উভয়ের সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সহায়তার ধরন নির্ধারণে মানুষের পছন্দ, পুষ্টির প্রয়োজন, মূল্যস্ফীতি, নিরাপত্তা, লিঙ্গসমতা এবং সহায়তা দ্রুত পৌঁছানোর সক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে।

৭৯. মানবিক ও খাদ্য সহায়তাকে কীভাবে অধিকারভিত্তিক করা যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা যায়?

মানবিক ও খাদ্য সহায়তাকে দান বা অনুগ্রহ হিসেবে নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার এবং রাষ্ট্র ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হিসেবে পরিচালনা করতে হবে। সহায়তা হতে হবে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর, সময়োপযোগী এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ও বিশেষ চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন ও ঝুঁকির ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয় বা সামাজিক অবস্থানের কারণে কাউকে বৈষম্যের শিকার করা যাবে না। নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং পুষ্টিঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সহায়তা বিতরণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্য প্রকাশ, অভিযোগ গ্রহণ, ভুল সংশোধন ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

মানবিক সহায়তা শুধু তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সংকট কাটিয়ে মানুষের স্বনির্ভরতা পুনর্গঠনের জন্য এটিকে জীবিকা, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ

৮০. তথ্য বা ডেটা খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কীভাবে সহায়তা করে?

সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া মানুষের খাদ্য পরিস্থিতি, ঝুঁকি ও প্রয়োজন সম্পর্কে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। তথ্য বা ডেটার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, কোথায় অপুষ্টির হার বেশি, কারা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাইরে রয়েছে কিংবা কোন এলাকায় খাদ্যের সংকট তৈরি হচ্ছে, এসব বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এই তথ্যগুলো রাষ্ট্র ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি পরিচালনায় সহায়তা করে। খাদ্য উৎপাদন, বাজারদর, আয়, কর্মসংস্থান, জলবায়ু ঝুঁকি ও পুষ্টি পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করতে পারে। একইসাথে তথ্য পর্যবেক্ষণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে, অধিকারভোগী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেও তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে তাদের কী ধরনের অধিকার রয়েছে, কোন সরকারি সেবা বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য, কোথায় এবং কীভাবে সহায়তা পাওয়া যায়, কিংবা কোনো অনিয়ম বা বঞ্চনার ক্ষেত্রে কোথায় অভিযোগ জানানো যায়। সঠিক তথ্য মানুষের সচেতনতা, দাবি উত্থাপনের সক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে জরুরি ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, তথ্য বা ডেটা একদিকে যেমন রাষ্ট্রকে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে, অন্যদিকে অধিকারভোগী মানুষকেও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও ক্ষমতায়িত করে তোলে।

৮১. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নে কোন সূচক ও পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়?

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নে কাঠামোগত, প্রক্রিয়াগত ও ফলাফলভিত্তিক, এই তিন ধরনের সূচক ব্যবহার করা যায়।

কাঠামোগত সূচক দেখবে অধিকার বাস্তবায়নে সংবিধান, আইন,

নীতি, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিকার ব্যবস্থা আছে কি না। প্রক্রিয়াগত সূচক দেখবে বাজেট, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি ও পুষ্টিসেবা, খাদ্য পরীক্ষা, বাজার তদারকি, জনগণের অংশগ্রহণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কেমন। ফলাফলভিত্তিক সূচক দেখবে ক্ষুধা, মাঝারি ও গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, শিশু খর্বতা ও কৃশতা, রক্তস্বল্পতা, খাদ্য বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্যকর খাদ্য কেনার সামর্থ্য এবং অনিরাপদ খাদ্যের বাস্তব পরিস্থিতি।

বাংলাদেশে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নে সামাজিক সুরক্ষার আওতা, বাজারদর, নিরাপদ খাদ্য পরীক্ষার ফলাফল, আঞ্চলিক ঝুঁকি, দুর্যোগের ক্ষতি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্যও সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সূচকগুলো লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, আয়, পেশা ও অঞ্চল অনুযায়ী আলাদা করতে হবে, যাতে জাতীয় গড়ের আড়ালে থাকা বৈষম্য দেখা যায়। এর সাথে সাথে পরিবারভিত্তিক জরিপ, পুষ্টি ও খাদ্য গ্রহণ জরিপ, বাজার পর্যবেক্ষণ, প্রশাসনিক তথ্য, সামাজিক নিরীক্ষা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাক্ষ্য একত্রে ব্যবহার করা গেলে মূল্যায়নের ফলাফল আরও বেশি নির্ভরযোগ্য হবে।

৮২. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কীভাবে কাজ করে?

নাগরিক সমাজভিত্তিক পর্যবেক্ষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটি সংগঠন, গবেষক, গণমাধ্যম ও নাগরিকরা খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এর লক্ষ্য হলো যে কোনো রকম পক্ষপাতিত্বমুক্ত থেকে অধিকার সুরক্ষার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ প্রক্রিয়ায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে ক্ষুধা, অপুষ্টি, খাদ্যমূল্য, ত্রাণ বণ্টন, সামাজিক সুরক্ষা, বাজেট ব্যবহার বা বৈষম্যের অবস্থা বিশ্লেষণ করে। পাশাপাশি জনগণের অভিজ্ঞতা, অভিযোগ ও প্রয়োজনও নথিভুক্ত করা হয়। এরপর প্রতিবেদন প্রকাশ, সামাজিক নিরীক্ষা, গণশুনানি, গণমাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন, আদালতে জনস্বার্থে মামলা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়। এর ফলে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত হয়, জনমত গড়ে ওঠে এবং সরকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়।

৮৩. ডিজিটাল প্রযুক্তি কীভাবে খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং এর ঝুঁকি কী?

উপকারভোগী নিবন্ধন, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, নগদ সহায়তা, খাদ্য বিতরণ, বাজারদর, খাদ্য মজুত, আবহাওয়া ও ফসলের তথ্য

পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ব্যবস্থা দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। মোবাইল বার্তা, ডিজিটাল ভাউচার, অনলাইন মানচিত্র এবং তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা খাদ্য সহায়তা আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও কার্যকর করতে পারে।

তবে জাতীয় পরিচয়পত্র, বায়োমেট্রিক তথ্য, মোবাইল প্রযুক্তি বা অ্যালগরিদমভিত্তিক নির্বাচন ব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন, ভুল তথ্যের কারণে বাদ পড়া, ডিজিটাল বৈষম্য এবং প্রযুক্তিতে সীমিত প্রবেশাধিকারের মতো ঝুঁকি তৈরি হতে পারে । এসব ঝুঁকিতে নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, নথিহীন ব্যক্তি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না এবং তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষকে নিজের তথ্য দেখার, সংশোধনের এবং ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ থাকতে হবে। একই সঙ্গে অ্যালগরিদমভিত্তিক সিদ্ধান্তের মানবিক পর্যালোচনা নিশ্চিত করতে হবে এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার পাশাপাশি অফলাইন বিকল্পও চালু রাখতে হবে, যাতে কোনো যোগ্য ব্যক্তি শুধু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

৮৪. খাদ্যের অধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করে এবং কী ধরণের কাজ করে?

খাদ্যের অধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। কেউ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে, কেউ জরুরি খাদ্য সহায়তা দেয়, কেউ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, কেউ দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবিকা উন্নয়ন করে। সমন্বিতভাবে এই সংস্থাগুলো বৈশ্বিক ক্ষুধা, অপুষ্টি ও খাদ্য সংকট মোকাবিলায় কাজ করে থাকে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও): বিশ্বব্যাপী কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, মৎস্য, বন ও গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। কৃষিনীতি প্রণয়ন, উন্নত বীজ, টেকসই কৃষি প্রযুক্তি, খাদ্য তথ্যব্যবস্থা, পুষ্টি নীতি এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশকে সহায়তার পাশাপাশি খাদ্যের অধিকারভিত্তিক নীতি ও নির্দেশনাও প্রদান করে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি): জরুরি পরিস্থিতিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানকারী প্রধান সংস্থা। যুদ্ধ, দুর্যোগ, বন্যা, খরা, বাস্তুচ্যুতি বা দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে খাদ্য, নগদ সহায়তা বা খাদ্য কুপন দেয়। এছাড়া বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি, পুষ্টি সহায়তা এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও পরিচালনা করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও): খাদ্য নিরাপত্তার স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট দিকগুলো নিয়ে কাজ করে। নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যজনিত রোগ প্রতিরোধ, অপুষ্টি মোকাবিলা, মাতৃ ও শিশুপুষ্টি, খাদ্য মানদণ্ড এবং জনস্বাস্থ্য নীতিতে সহায়তা করে। খাদ্যের গুণগত মান ও নিরাপদ ভোগ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ): শিশু ও মায়েদের পুষ্টি নিরাপত্তায় কাজ করে। শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ, স্তন্যদানে উৎসাহ প্রদান, পরিপূরক খাদ্য, স্কুলপূর্ব পুষ্টি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং জরুরি অবস্থায় শিশু খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। শিশুদের খাদ্যের অধিকার রক্ষায় এটি অন্যতম প্রধান সংস্থা।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি): দারিদ্র্য হ্রাস, জীবিকা উন্নয়ন, সুশাসন, জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে। এটি রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল: আইএফএডি মূলত ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক মানুষের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে। কৃষিঋণ, বাজারসংযোগ, গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

সমষ্টিগতভাবে এসব সংস্থা খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে কাজ করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এবং সংকটকালে মানবিক সহায়তা। তাই বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তায় এদের ভূমিকা পরস্পরসম্পূরক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮৫. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডজি)-তে খাদ্যের অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ২নং লক্ষ্য হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধার অবসান ঘটানো, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং টেকসই কৃষির প্রসার ঘটানো। এতে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র, শিশু এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে সব ধরনের অপুষ্টি দূর করা, ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূমি, প্রযুক্তি, বাজার, আর্থিক সেবা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদে ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন শুধু ২ নম্বর লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লক্ষ্য ৩-এ স্বাস্থ্য, লক্ষ্য ৬-এ নিরাপদ পানি, লক্ষ্য ১০-এ বৈষম্য হ্রাস, লক্ষ্য ১২-এ টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, লক্ষ্য ১৫-এ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং লক্ষ্য ১৬-এ জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যও খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো বাস্তবায়নকে শুধু রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনের যৌথ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ ক্ষুধা,

দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈষম্যমূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো চ্যালেঞ্জ এককভাবে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বহুপক্ষীয় অংশীদারিত্ব এবং কার্যকর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮৬. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কৃষিচুক্তি খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

খাদ্যের ঘাটতি পূরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং কৃষিপণ্যের আদান-প্রদান সহজ করতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির আওতায় উন্নত দেশগুলো উচ্চ ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম দামে উন্নয়নশীল দেশের বাজারে রপ্তানি করলে স্থানীয় ক্ষুদ্র কৃষক ন্যায্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন না। এর ফলে কৃষকের আয় কমে, স্থানীয় উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য উৎপাদন ও জীবিকা উভয়ই ঝুঁকির মুখে পড়ে।

অন্যদিকে, পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া বাণিজ্য উদারীকরণ করা হলে একটি দেশ ক্রমেই আমদানিনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধ, রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বা সরবরাহ সংকট দেখা দিলে খাদ্যের দাম বেড়ে যায় এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার আরও সীমিত হয়ে পড়ে।

তাই কৃষি বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্যের অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ক্ষুদ্র কৃষকের সুরক্ষা, ন্যায্য ভর্তুকি, সরকারিভাবে খাদ্য মজুত, প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। কোনো বাণিজ্য চুক্তিই ক্ষুধা দূরীকরণ ও সবার খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বকে খর্ব করতে পারে না।

৮৭. আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও সরবরাহ শৃঙ্খল খাদ্যের অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল একদিকে খাদ্য উৎপাদন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, কর্মসংস্থান এবং খাদ্যঘাটতির পরিস্থিতিতে আমদানির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে এক দেশে উৎপাদিত খাদ্য দ্রুত অন্য দেশে পৌঁছানো এবং ভোক্তার কাছে খাদ্য সহজলভ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তবে এসব ব্যবস্থা যদি ন্যায্য, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালিত না হয়, তাহলে ক্ষুদ্র কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে

পারেন, বড় কর্পোরেশন বীজ, বাজার ও খাদ্য শৃঙ্খলের ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ভূমি দখল, পানি দূষণ, শ্রমিক শোষণ, পরিবেশের ক্ষতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উচ্ছেদের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত আমদানিনির্ভরতা বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধি বা সরবরাহ বিঘ্নিত হলে দেশের দরিদ্র ও খাদ্য-অনিরাপদ জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

তাই বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংক্রান্ত যেকোনো চুক্তি বা নীতি গ্রহণের আগে খাদ্যের অধিকার, ভূমি, পানি, শ্রম, পরিবেশ, পুষ্টি এবং স্থানীয় উৎপাদনের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উৎস শনাক্তকরণ, মানবাধিকার যাচাই, তথ্য প্রকাশ, কার্যকর অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ন্যায্য অংশগ্রহণ ও লাভ নিশ্চিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি বা কৃষি নীতি বাংলাদেশের খাদ্য অধিকারকেও প্রভাবিত করে থাকে। যেমন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য নীতি, কৃষি চুক্তি, মৎস্য চুক্তি, ই-কমার্স নীতি, মেধাস্বত্ব নীতি ইত্যাদির সরাসরি প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার উপর খুবই স্পষ্ট। এছাড়াও আঞ্চলিক বাণিজ্য নীতি, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের শর্ত ইত্যাদিও দেশের কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থা তথা মানুষের খাদ্য অধিকারকে ব্যাপক ও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এসব থেকে দেশের কৃষি ও মানুষের খাদ্য অধিকারকে সুরক্ষা দেবার পাশাপাশি সেসব নীতি ও চুক্তি পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক দেন দরবারে অংশগ্রহন করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত।

৮৮. আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা কীভাবে খাদ্যের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?

আন্তর্জাতিক কোনো নিষেধাজ্ঞার ফলে কোনো দেশের খাদ্য আমদানি, কৃষি উৎপাদন, আর্থিক লেনদেন বা সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা কমে যেতে পারে, দাম বাড়তে পারে এবং সাধারণ মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার দুর্বল হতে পারে। নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, জাহাজ পরিবহন, বীমা বা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে বাধা তৈরি হলে খাদ্য, সার, বীজ, ওষুধ বা কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে কৃষি উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে বাজেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন ও নীতিতে খাদ্যের অধিকার স্বীকার করলেই তা মানুষের

জীবনে বাস্তবায়িত হয় না। খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপদ খাদ্য, বাজার তদারকি, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং মানবিক সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও যথাযথভাবে ব্যয় করতে হয়। তাই বাজেট হলো খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অঙ্গীকারের আর্থিক প্রকাশ।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রকে তার সর্বোচ্চ ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের খাদ্যের অধিকার পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এর অর্থ হলো রাষ্ট্রকে খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারে ন্যায্যতা, কার্যকারিতা ও বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন শুধু জাতীয় বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে স্থানীয় সরকারের বাজেট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, জলবায়ু তহবিল, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা, জাতিসংঘের মানবিক তহবিল, দাতা সংস্থার অনুদান এবং বেসরকারি মানবিক সংস্থার অর্থায়নও যুক্ত। বিশেষ করে শরণার্থী, বাস্তুচ্যুত ও দীর্ঘমেয়াদি সংকটে থাকা জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি।

খাদ্যের অধিকারভিত্তিক বাজেটে কৃষি উৎপাদন, ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের সহায়তা, সরকারি খাদ্য মজুত, নিরাপদ খাদ্য, মাতৃ ও শিশুপুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং দুর্যোগকালীন খাদ্য ও নগদ সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে। শরণার্থী, জলবায়ু বাস্তুচ্যুত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, শহুরে দরিদ্র এবং দুর্গম এলাকার মানুষের বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও পৃথক ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যস্ফীতি, খাদ্যের দাম, উৎপাদন খরচ এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে বরাদ্দ নিয়মিত সমন্বয় করা প্রয়োজন।

৮৯. জাতীয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজেট কীভাবে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নকে কয়েকটি দিক থেকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রথমত, খাদ্য, কৃষি, পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেই বরাদ্দ মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কি না। তৃতীয়ত, অর্থ সময়মতো ছাড় ও গুণগত ব্যয় হচ্ছে কি না। চতুর্থত, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছাচ্ছে কি না। পঞ্চমত, এই ব্যয় ক্ষুধা, অপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কমাতে পারছে কি না। ভর্তুকি, কর, আমদানি শুল্ক, খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নগদ সহায়তার

মতো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তও মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকারকে প্রভাবিত করে। তাই শুধু সরাসরি খাদ্য ও সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দ নয়, সামগ্রিক রাজস্ব ও অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবও খাদ্যের অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ও মানবিক সহায়তার অর্থায়ন যেন অনিয়মিত, স্বল্পমেয়াদি বা দাতাদের পরিবর্তনশীল অগ্রাধিকারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়। দীর্ঘস্থায়ী সংকটের ক্ষেত্রে বহু বছরের অর্থায়ন পরিকল্পনা, জরুরি তহবিল, আগাম অর্থায়ন এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে স্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন প্রয়োজন। মানবিক সহায়তাকে সামাজিক সুরক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। খাদ্যের অধিকারভিত্তিক বাজেট পর্যাপ্ত, বৈষম্যহীন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে। সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, দাতা ও মানবিক সংস্থাকে বরাদ্দ, ব্যয়, সহায়তার পরিমাণ, উপকারভোগী এবং অর্জিত ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। সংসদ, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, নাগরিক সমাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি অভিযোগ ও প্রতিকার পাওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অর্থাৎ খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেট, স্থানীয় বাজেট এবং আন্তর্জাতিক মানবিক ও উন্নয়ন তহবিলকে একটি সমন্বিত অর্থায়ন কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। অধিকার থেকে বাজেট, বাজেট থেকে কর্মসূচি, কর্মসূচি থেকে সেবা এবং সেবা থেকে মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন, এই ধারার প্রতিটি ধাপ কার্যকর হলেই খাদ্যের অধিকার বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৯০. জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ ও সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা খাদ্যের অধিকার বিষয়ে কীভাবে জবাবদিহিতা তৈরি

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের অধীন সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা বা ইউপিআরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রতিটি রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এটি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের অধীন একটি রাষ্ট্রভিত্তিক পর্যালোচনা ব্যবস্থা । এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিবেদন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার তথ্য এবং নাগরিক সমাজ ও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়া প্রতিবেদন বিবেচিত হয়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্র প্রশ্ন তোলে এবং সুপারিশ প্রদান করে।

খাদ্যের অধিকার বিষয়ে ইউপিআরে ক্ষুধা, অপুষ্টি, খাদ্যে বৈষম্যমূলক প্রবেশাধিকার, নিরাপদ খাদ্য, কৃষকের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা, ভূমি ও জীবিকার নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের

প্রভাব এবং নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি তুলে ধরা যায়। নাগরিক সমাজ বিকল্প প্রতিবেদন বা তথ্য জমা দিয়ে সরকারি প্রতিবেদনের ঘাটতি চিহ্নিত করতে এবং নির্দিষ্ট সুপারিশের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে।

পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্র কোন সুপারিশ গ্রহণ করেছে, কোনটি গ্রহণ করেনি এবং গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নে কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা পরবর্তী পর্যালোচনায় যাচাই করা হয়। মানবাধিকার পরিষদ সাধারণত জাতীয় আদালতের মতো সরাসরি আইন প্রয়োগ বা শাস্তি প্রদান করে না। তবে প্রকাশ্য পর্যালোচনা, আন্তরাষ্ট্রীয় প্রশ্ন, লিখিত সুপারিশ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং নাগরিক সমাজের অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও নৈতিক জবাবদিহি তৈরি করে।

৯১. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক কমিটি রাষ্ট্রকে কীভাবে জবাবদিহির আওতায় আনে?

জাতিসংঘের চুক্তিভিত্তিক কমিটিগুলো মূলতঃ অনুসমর্থিত মানবাধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে। খাদ্য অধিকারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক কমিটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সনদে সমর্থন জানিয়েছে এমন রাষ্ট্রগুলো নির্দিষ্ট সময় পর পর আইন, নীতি, বাজেট ও ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়। কমিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করে এবং নাগরিক সমাজ, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও জাতিসংঘের অন্যান্য উৎসের তথ্যও বিবেচনা করে।

পর্যালোচনার পর কমিটি সমাপনী পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ দেয়। এতে ক্ষুধা, অপুষ্টি, বৈষম্য, সামাজিক সুরক্ষা, ভূমি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রতিকার ব্যবস্থার ঘাটতি তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, সুপারিশ ও অনুসরণের এই চক্রের মাধ্যমে কমিটিগুলো রাষ্ট্রকে জবাবদিহির আওতায় আনে।

৯২. খাদ্যের অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার এর ভূমিকা কী?

খাদ্যের অধিকারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার জাতিসংঘের একজন স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ। তিনি বিভিন্ন দেশে খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের অবস্থা, সমস্যা ও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে সফর, গবেষণা, সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘনের কারণ চিহ্নিত করেন। খাদ্যমূল্য, ভূমি দখল, কৃষকের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, অপুষ্টি, কর্পোরেট কার্যক্রম ও খাদ্যব্যবস্থার

বৈষম্যের মতো বিষয়গুলো তার প্রতিবেদনে উঠে আসতে পারে।

তিনি জাতিসংঘের কাছে খাদ্য অধিকারবিষয়ক প্রতিবেদন ও সুপারিশ উপস্থাপন করেন এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা চান। খাদ্যের অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার এর সুপারিশ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক না হলেও নীতি পরিবর্তন, জনসচেতনতা ও আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৯৩. বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি (সিএফএস) খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কী ভূমিকা পালন করে?

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি (সিএফএস) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ‘আন্তসরকারি ও বহু অংশীজনের প্ল্যাটফর্ম’। এখানে রাষ্ট্র, জাতিসংঘের সংস্থা, নাগরিক সমাজ, গবেষক, কৃষক প্রতিনিধি ও বেসরকারি খাত একসঙ্গে আলোচনা করে।

সিএফএস খাদ্যের অধিকার, ক্ষুধা, অপুষ্টি, কৃষি, ভূমি, বিনিয়োগ ও খাদ্যব্যবস্থা বিষয়ে নীতিগত নির্দেশনা তৈরি করে। এটি বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে সমন্বিত নীতি গ্রহণে সহায়তা করে। তবে সিএফএস নিজে কোনো দেশে আইন প্রয়োগ বা খাদ্য বিতরণ করে না। এর মূল ভূমিকা হলো আন্তর্জাতিক ঐকমত্য তৈরি, নীতিগত নির্দেশনা দেওয়া এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো।

বাংলাদেশ সিএফএসের নির্দেশনা অনুসরণ করে কৃষি, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা ও খাদ্যবাজারের নীতির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে পারে।

৯৪. সিভিল সোসাইটি মেকানিজম (সিএসএম) খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কীভাবে কাজ করে?

সিভিল সোসাইটি মেকানিজম (সিএসএম) ‘নাগরিক সমাজ ও আদিবাসী জনগণের অংশগ্রহণ ব্যবস্থা’; এটি বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটিতে নাগরিক সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিশ্রমিক, জেলে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, যুব, ভোক্তা এবং খাদ্যসংকটে থাকা মানুষের মতামত আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণে তুলে ধরা হয়।

খাদ্যবিষয়ক নীতি যেন শুধু সরকার, বিশেষজ্ঞ বা বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি না হয়। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যসংকটের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন মানুষও যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। এই মেকানিজম স্থানীয় সমস্যাকে আন্তর্জাতিক আলোচনায় তুলে ধরে, নীতিগত দুর্বলতা চিহ্নিত করে

এবং রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা দাবি করে। এভাবে সিএসএম খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও বৈষম্যহীনতার নীতিকে শক্তিশালী করে।

৯৫. গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক কী এবং এটি নীতিনির্ধারণে কীভাবে সহায়তা করে?

গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক বা জিএসএফ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক নীতিগত কাঠামো। এটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল, খাদ্যের অধিকারবিষয়ক নির্দেশনা এবং খাদ্য নিরাপত্তাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোকে একত্রে উপস্থাপন করে ।

জিএসএফ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক কোনো চুক্তি নয়। এটি রাষ্ট্রকে খাদ্য, কৃষি, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, বাজার, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদবিষয়ক নীতির মধ্যে সমন্বয় করতে সহায়তা করে এবং নীতি প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, বাস্তবায়ন, অংশগ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণ দিকনির্দেশনা দেয়। বাংলাদেশের মতো দেশে জিএসএফ জাতীয় খাদ্যনীতি ও কর্মপরিকল্পনাকে খাদ্যের অধিকারভিত্তিক এবং আরও সমন্বিত করতে সহায়তা করতে পারে।

৯৬. পরিবেশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুশাসন বা ESG কাঠামো খাদ্য খাতে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইএসজি বলতে পরিবেশ, সামাজিক বিষয় এবং সুশাসনকে বোঝায়। এই কাঠামোর মাধ্যমে কোনো কোম্পানি, বিনিয়োগকারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসনসংক্রান্ত ঝুঁকি, কার্যসম্পাদন ও প্রকাশনা মূল্যায়নের কাঠামো।

খাদ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইএসজি কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষি উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পানি ব্যবহার, শ্রমিকের অধিকার, প্যাকেজিং, দূষণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের কার্যক্রম মানুষের খাদ্যের অধিকারকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

পরিবেশগত ক্ষেত্রে ইএসজি কাঠামোর মধ্দিয়ে দেখতে হবে কোনো কোম্পানি, বিনিয়োগকারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কতটা পানি ব্যবহার করছে, মাটি ও পানি দূষণ করছে কি না, ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করছে কি না, জীববৈচিত্র্য নষ্ট করছে কি না এবং জলবায়ু পরিবর্তনে কতটা ভূমিকা রাখছে। সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ক্ষুদ্র কৃষকের ন্যায্য মূল্য, নারীর অংশগ্রহণ, ভোক্তার নিরাপত্তা এবং পুষ্টির ওপর পণ্যের প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও তথ্য কতটা স্বচ্ছ, দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে কি না, এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অভিযোগ ও প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ পায় কি না, তা

দেখতে হবে।

তবে ইএসজি নিজে মানবাধিকার কাঠামো নয়। অনেক প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি বা প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ইএসজি কাঠামো ব্যবহার করতে পারে। তাই খাদ্যব্যবস্থায় ইএসজিকে কার্যকর করতে খাদ্যের অধিকারভিত্তিক স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য সূচক প্রয়োজন। যেমন, অনিরাপদ খাদ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের হার, কৃষকের ন্যায্য মূল্য, শ্রমিকের মজুরি, নারী ও ক্ষুদ্র উৎপাদকের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তির হার এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে মানবাধিকার যাচাই।

অতএব,খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকের ন্যায়সংগত অধিকার, শ্রমিকের সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা এবং ভোক্তার অধিকারকে যুক্ত করা হলে ইএসজি জবাবদিহিতার কার্যকর উপকরণ হতে পারে।

৯৭. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে খাদ্যের অধিকার রক্ষার জন্য কী শর্ত থাকা প্রয়োজন?

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে খাদ্যের অধিকার রক্ষার মূল শর্ত হলো জনস্বার্থ, সমতা ও জবাবদিহিকে মুনাফার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। বেসরকারি খাতের অর্থ, প্রযুক্তি, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজার ব্যবস্থাপনার দক্ষতাকে খাদ্যের অধিকার রক্ষায় কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে এর ফলে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি, বাজারে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র কৃষকের বঞ্চনা, জমি দখল, তথ্য গোপন বা সেবার মান কমে যাওয়ার ঝুঁকি যেন তৈরি না হয়।

এ জন্য অংশীদারত্বের আগে মানবাধিকার ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। চুক্তিতে উন্মুক্ত দরপত্র, সাশ্রয়ী মূল্য, খাদ্যের নিরাপত্তা ও মান, নিয়মিত সরবরাহ, ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, তথ্য প্রকাশ, স্বাধীন নিরীক্ষা এবং কার্যকর অভিযোগ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান শর্ত ভঙ্গ করলে জরিমানা, ক্ষতিপূরণ, চুক্তি বাতিল এবং বিকল্প সেবা চালুর সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

সরকার কোনো দায়িত্ব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে দিলেও খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও মানবাধিকারগত দায়িত্ব আসলে রাষ্ট্রেরই থাকে। তাই অংশীদার নির্বাচন থেকে সেবা প্রদান পর্যন্ত সরকারকে পুরো প্রক্রিয়া নিয়মিত তদারক করতে হবে এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৯৮. অধিকারভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থা কীভাবে গড়ে উঠবে?

অধিকারভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর, সাশ্রয়ী এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্য পাবে। মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি শুধু আয়, বাজার বা ব্যবসার মুনাফার ওপর নির্ভর করবে না।

এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, কৃষিশ্রমিক, নারী, আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি, পানি, বীজ, কাজ, ন্যায্যমূল্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। খাদ্যের মান, বাজার, পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি থাকবে।

এ ধরনের খাদ্যব্যবস্থা গড়তে শুধু উৎপাদনের পরিমাণ নয়, খাদ্যের পুষ্টিমান, বৈচিত্র্য, নিরাপত্তা এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। একমুখী উৎপাদনের পরিবর্তে বৈচিত্র্যময় ও জলবায়ু সহনশীল কৃষি গড়ে তুলতে হবে। বিচ্ছিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিবর্তে সমন্বিত ও পুষ্টিসংবেদনশীল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দুর্যোগের পর সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি আগাম প্রস্তুতি ও স্থায়ী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

এর জন্য সুস্পষ্ট আইন, দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, সমন্বিত নীতি, পর্যাপ্ত বাজেট, জনঅংশগ্রহণ, নির্ভরযোগ্য তথ্য, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর অভিযোগ ও প্রতিকারব্যবস্থা প্রয়োজন। এভাবেই খাদ্যকে সাময়িক সহায়তা থেকে একটি কার্যকর ও দাবি করা যায় এমন অধিকারে রূপ দেওয়া সম্ভব।

৯৯. ক্ষমতা, ব্যবসায়িক স্বার্থ ও রাজনৈতিক অর্থনীতি খাদ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

খাদ্যনীতি কেবল তথ্য, উৎপাদনের পরিসংখ্যান বা কারিগরি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, রাজনৈতিক অগ্রাধিকার, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব এবং বিভিন্ন পক্ষের দরকষাকষির সক্ষমতা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে। নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বড় আমদানিকারক, মিলার ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর যোগাযোগ, সংগঠিত চাপ, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং

রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে শুল্ক, আমদানি, ভর্তুকি, সরকারি ক্রয় ও মজুতসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে। বিপরীতে, ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিশ্রমিক, নিম্ন আয়ের ভোক্তা ও নারীদের সংগঠিত প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবেশাধিকার তুলনামূলকভাবে সীমিত থাকে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে নীতির সুবিধা অসমভাবে বণ্টিত হয়।

আমদানি শুল্ক কমালে ভোক্তার জন্য দাম কমতে পারে, কিন্তু ফসল ওঠার সময় আমদানি করা হলে স্থানীয় কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আবার সরকারি ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হলেও সংগ্রহব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব থাকলে ক্ষুদ্র কৃষক সরাসরি সুবিধা পান না। একইভাবে, ওএমএস ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বরাদ্দ, উপকারভোগী নির্বাচন ও পণ্য বিতরণে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম বা স্থানীয় ক্ষমতার সম্পর্ক দরিদ্র মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে।

তাই খাদ্যনীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে দেখতে হয়, কে সিদ্ধান্ত নেয়, কার তথ্য ও মতামত বিবেচিত হয়, কে আর্থিক সুবিধা পায়, কে ব্যয় বহন করে এবং কার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় না। অধিকারভিত্তিক খাদ্যনীতির জন্য সিদ্ধান্তের যুক্তি ও বাজারতথ্য প্রকাশ, স্বার্থের সংঘাত নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ, স্বাধীন নজরদারি এবং কৃষক, শ্রমিক, নারী ও নিম্ন আয়ের মানুষের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি।

১০০. খাদ্যব্যবস্থার সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কীভাবে করা উচিত?

খাদ্যব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জরুরিভাবে প্রয়োজন হলো মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও সম্পদ, বাজার ও নিরাপদ খাদ্যের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, একীভূত তথ্যব্যবস্থা, জনঅংশগ্রহণ এবং স্বাধীন অভিযোগ ও প্রতিকার। আইন থেকে প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মসূচি, কর্মসূচি থেকে সেবা, সেবা থেকে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সংশোধন, এই পুরো ধারাটিই কার্যকর করতে হবে। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির পাশাপাশি খাদ্যব্যবস্থার আইন, প্রতিষ্ঠাতিক সমন্বয়, তথ্য বিনিময়, জনঅংশগ্রহণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে।

১০১. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়?

খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি শুধু খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে না। ক্ষুধা ও অপুষ্টি, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য কেনার সামর্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা,

বৈষম্য, জনঅংশগ্রহণ, অভিযোগ ও প্রতিকার এবং সরকারি বাজেটের কার্যকর ব্যবহারও মূল্যায়ন করতে হবে।

তথ্যকে লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, আয়, পেশা, জনগোষ্ঠী ও অঞ্চল অনুযায়ী আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে। এতে কারা অগ্রগতি থেকে বাদ পড়ছে তা শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময় পরপর সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, বাজেট ও কর্মসূচির ফলাফল পর্যালোচনা করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তারও নিয়মিত অনুসরণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

VOTE
VOTE

খাদ্য কি কেবল মানুষের মৌলিক চাহিদা, নাকি রাষ্ট্রের কাছে দাবি করার মতো একটি অধিকার?

এই বইয়ে ১০১টি প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, আইন, কৃষি, বাজার, সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নাগরিক জবাবদিহির বিষয়গুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। খাদ্যপ্রাপ্তিতে বৈষম্য কেন তৈরি হয় এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে প্রতিকার কী, বইটি সেই জরুরি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছে।

এটি খাদ্যকে দয়া-দাক্ষিণ্য নয়- অধিকার হিসেবে দেখার প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে। নিজের অধিকার জানতে, অন্যায় ও বঞ্চনার কারণ বুঝতে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক খাদ্যব্যবস্থার দাবি শক্তিশালী করতে বইটি পড়ুন।

Brot für die Welt

KHANI খানি FOOD SECURITY NETWORK BANGLADESH

praan